হক সাহেবও সঙ্গে ছিলেন। গাড়ী আমাদের তিনজনকে নিয়ে সন্‌আর বিভিন্ন মহল্লা অতিক্রম করে অগ্রসর হতে থাকে।

সন্‌আ পৃথিবীর প্রাচীনতম নগরীসমূহের অন্তর্গত। তাতে প্রাচীনতার ছাপ আজও সুস্পষ্ট। কতিপয় ঐতিহাসিক লেখেন, এ নগরীর গোড়াপত্তন করেন হযরত নূহ আলাইহিস সালামের নাতি গামদান বিন সাম। (মু'জামুল বুলদান লিল হামভী, পৃঃ ৮৪৩, খণ্ড–২)

নগরীটির প্রাচীন নাম ছিল 'আযাল'। হযরত নূহ আল্লাইহিস সালামের জনৈক সন্তানের নামে এর নামকরণ করা হয়। পরবর্তীতে আবিসিনিয়ার অধিবাসী কিছু লোক এখানে এসে প্রস্তর নির্মিত এই শহর দেখে বলে 'সনআ', 'সন্‌আ'। আবিসিনীয়দের ভাষায় এর অর্থ 'এটি বড় মজবতু নগরী'। তখন থেকেই এই নগরীর নাম 'সনআ' প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

(মু'জামুল বুলদান লিল হামভী, পৃঃ ২৬, খণ্ড–৪)

এ নগরী বহুবিধ প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে এর উপর পারস্য সম্রাট কিস্‌রার আধিপত্য ছিল। কিসরার পক্ষ থেকে বাযান নামক একজন গভর্নর এখানে শাসন চালাত। পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে মুসলমান হওয়ার তাওফীক দান করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকেই নিজের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

(আল ইসাবা, হাফেজ ইবনে হাজার কৃত)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনের শেষ দিকে এখানে মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবীদার আসওয়াদে আনাসী বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অনেক লোক তার প্রতারণার জালে ফেঁসে যায়। অবশেষে সে হযরত বাযান (রাযিঃ)কে শহীদ করে সন্‌আ দখল করে। কিন্তু তার দখলদারিত্ব বেশীদিন টেকসই হয়নি। হযরত ফিরোজ দাইলামী (রাযিঃ)—যিনি ইয়ামানেরই অধিবাসী ছিলেন—আসওয়াদে আনাসীকে হত্যা করে সন্‌আকে তার হাত থেকে মুক্ত করেন। এ ঘটনা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম রোগকালীন সময়ের। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ঘটনা অবহিত করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বলেন, আসওয়াদে আনাসী নিহত হয়েছে। ফিরোজ

দাইলামী (রাযিঃ) তাকে হত্যা করেছে।

(আল ইসতিয়াব, ইবনে আবদুল বার কৃত, পৃঃ ২০৪–২০৫, খণ্ড–৩)

তারপর থেকে এ নগরী মুসলমানদের হাতেই রয়েছে।

এখন আমাদের গন্তব্য সন্‌আর প্রাচীন নগরী। কিন্তু সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে আধুনিক নগরীর বিভিন্ন মহল্লা অতিক্রম করতে করতে মাগরিবের সময় হয়ে যায়। তাই আমরা পথের একটি মসজিদে নামায পড়ার জন্য যাত্রা বিরতি করি। আযান শেষ হওয়ার পরও মুয়ায্‌যিন মাইকে কিছু বাক্য পাঠ করছিল। কাছে গিয়ে অনুমিত হল যে, সে কিছু দু'আ পাঠ করছে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, এখানকার প্রচলন হল, মুয়াযযিন একামতের কিছু পূর্বে দু'আ পাঠ করে। দু'আ শেষে একামত বলে। এখানকার বেশীর ভাগ মসজিদেই এ প্রচলন রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে মানুষের কর্মপন্থা দেখে একথা যথার্থই অনুমিত হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) থেকে প্রমাণিত সুন্নাত তরীকার তো একই রূপ, তাই পৃথিবীর যে কোন ভূখণ্ডে যান না কেন, সেগুলোর সেই একই রূপ দেখতে পাবেন। কিন্তু বিদআত যেহেতু মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত, আর প্রত্যেক মানুষের মানসিকতা ভিন্নরূপ, তাই বিদআতসমূহও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পন্থায় প্রচলিত। একটি পন্থাকে একদেশে জরুরী মনে করা হয় এবং তা নিয়ে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়, অথচ তা অন্য দেশের লোকের জানাও থাকে না। সুতরাং একামতের পূর্বে উচ্চস্বরে দু'আ করার এ পন্থা আমি অন্য কোন মুসলিম দেশে দেখিনি।

মাগরিব নামাযের পর শায়খ আদেল আমাদেরকে নিয়ে একটি প্রাচীন মহল্লা অতিক্রম করেন, যা ছিল জীর্ণ ভবনসমূহের সমন্বয়। এখানের একটি মসজিদের পিছনে তিনি আমাদেরকে তালাবদ্ধ একটি কক্ষের সম্মুখে নিয়ে দাঁড় করালেন। যেখানে বহুদূর পর্যন্ত ঘোর অন্ধকার বিরাজ করছিল। তিনি বললেন, তালাবদ্ধ এই কক্ষের মধ্যে দু'টি কবর রয়েছে। তার একটি কবর হযরত ফারওয়া ইবনে মুস্‌ক (রাযিঃ)এর, আর অপরটি আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন আল ওয়াযীর আস্‌ সান্‌আনী (রহঃ)এর।

হযরত ফরওয়া বিন মুস্‌ক (রাযিঃ) ঐ সমস্ত সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কেরামের অন্যতম, যাঁরা ৯ হিজরী বা ১১ হিজরী সনে ইয়ামান থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শনলাভের উদ্দেশ্যে মদীনায় গমন করেছিলেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে তাঁদের বনী মুরাদ ও বনী মুযহাজ গোত্রের জন্য নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন। (আল ইসাবা, পৃঃ ২০৫, খণ্ড–৩)

এমনি তো সন্‌আয় আরো অনেক সাহাবায়ে কেরামই সমাহিত হয়েছেন, তবে শায়খ আদেল বললেন যে, তার মধ্য থেকে কেবলমাত্র হযরত ফারওয়া বিন মুস্‌ক (রাযিঃ)এর কবর এখানে প্রসিদ্ধ। তাঁর নামেই অদূরবর্তী মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে 'মসজিদে মুস্‌ক'। বরং পুরো মহল্লাটিকেই 'মুস্‌ক' বলা হয়ে থাকে। কবরের এ কক্ষটি তালাবদ্ধ ছিল। তবে অদূরেই কিছু শিশু খেলা করছিল। তারা যখন দেখল যে, বাইরের কিছু লোক তালাবদ্ধ এই দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, তখন একটি শিশু কোথাও থেকে কক্ষের চাবি এবং একটি টর্চ নিয়ে এল। তালা খোলা হলে ভিতরে কক্ষের পরিবর্তে একটি গুহার ন্যায় দেখা গেল। টর্চের আলোতে দু'টি কবর দৃষ্টিগোচর হল। এখানে সালাম পেশ করার ও ফাতেহা পাঠ করার তাওফীক হল।

দ্বিতীয় কবরটি ছিল আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল ওয়াযীর আস সন্‌য়ানী (রহঃ)এর। তিনি অষ্টম বা নবম হিজরী শতাব্দীর প্রখ্যাত আলেমদের অন্যতম। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তবে তার মধ্যে 'আল আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম ফিযযাব্বি আন্ সুন্নাতি আবিল কাসিম' এবং 'আর রাওযুল বাসিম' অত্যাধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। তিনি হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ)এর সমসাময়িক। তাঁর পুরো পরিবার ছিল 'যায়দী'। হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) তাঁর ভাই আল্লামা হাদী বিন ইবরাহীম আল ওয়াযীরের আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর সম্পর্কেও দু' লাইন লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে,

مقبل على الاشتغال بالحديث، شديدى الميل الى السنة بخلاف اهل بيته

"তিনি হাদীস শাস্ত্রের লিপ্ততায় পূর্ণ মনোযোগী ছিলেন এবং স্বীয় পরিবারের বিপক্ষে তিনি সুন্নাতের প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন।"

হাফেজ সাখাভী (রহঃ) 'আয্ যাওউল লামে' গ্রন্থে তাঁর প্রশংসা করে বলেন যে, তিনি যায়েদী মতবাদের প্রত্যাখ্যানে 'আল আওয়াসেম ওয়াল কাওয়াসেম' গ্রন্থ রচনা করেন। তবে হাদীস ও ফেকাহর ক্ষেত্রে তিনি নিজেই ইজতিহাদ করতেন। ইমাম চতুষ্টয়ের কারো ফেকাহর অনুবর্তী ছিলেন না। আল্লামা শাওকানী (রহঃ) কমবেশী তাঁরই পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি তাঁকে 'মুজতাহিদে মুতলাক' আখ্যা দেন। তিনি তাঁর জ্ঞান–গরিমা বর্ণনায় অসাধারণ শব্দমালা প্রয়োগ করেন। তিনি বলেন—

والذى يغلب على الظن ان شيو خه لو جمعوا جميعا فى ذات واحدة لم يبلغ علمهم الى مقدار علمه، وناهيك بهنا.... ولو قلت: ان اليمن لم تنجب مثله لم ابعد عن الصواب.

অর্থ ঃ আমার প্রবল ধারণা এই যে, তাঁর সকল ওস্তাদকে একটি সত্তায় সমবেত করা হলে তাঁদের সকলের জ্ঞান তাঁর জ্ঞানের সমপরিমাণে পৌছতে পারবে না। আর এতটুকু বলাই যথেষ্ট.... আমি যদি বলি ইয়ামান তাঁর মত অন্য কাউকে জন্ম দেয়নি তাহলে তা অত্যুক্তি হবে না, বরং যথার্থই বলা হবে।

(আল বাদরুত তালী, শাওকানী কৃত পৃঃ ৯২, খণ্ড–২)

তাঁর দীর্ঘ একটি সময় সমকালীন লোকদের সঙ্গে জ্ঞানবিষয়ক বিতর্কে অতিবাহিত হয়েছে। তবে শেষকালে তিনি নিজেকে ইবাদতের কাজে নিযুক্ত করেন। তিনি নির্জনতা অবলম্বন করে ইবাদতে রত থাকেন। জীবনের যে অংশ সমকালীন লোকদের সঙ্গে বিতর্কে অতিবাহিত হয়েছিল তার জন্য তিনি আক্ষেপ করতেন।

(আল বাদরুত তালি', শাওকানী কৃত পৃঃ ৯২, খণ্ড–২)

এখান থেকে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর প্রাচীন সনআ নগরীর নগর–প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। প্রাচীরের একটি ফটক দিয়ে কার ভিতরে প্রবেশ করে। আমাদের মনে হতে লাগল, যেন আমরা কয়েক শতাব্দী পূর্বের একটি নগরীতে প্রবেশ করেছি। প্রাচীরঘেরা নগরী এখনও

পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে রয়েছে। আমার সেগুলো দেখারও সুযোগ হয়েছে। কিন্তু এ প্রাচীরঘেরা নগরীটি এদিক থেকে সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যে, এটি এখনও যথারীতি জীবন্ত একটি নগরীরূপে বিদ্যমান রয়েছে। বরং এর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুবিন্যাস আমার নিকট সনআর আধুনিক নগরী থেকেও অধিক মনে হয়। পাথর বা ইট দ্বারা নির্মিত সড়ক ও গলিপথসমূহ ধরণ-ধারণে প্রাচীন বলে মনে হলেও দৃঢ়তা ও উজ্জ্বলতায় তার উপর প্রাচীনতার কোন ছাপ পরিলক্ষিত হয় না।

প্রাচীরঘেরা এই নগরীতে আমাদের মূল গন্তব্য ছিল এখানকার সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রাচীন মসজিদ 'আল জামে' আল কাবীর'। আমরা যখন সেখানে পৌছলাম, তখন এশার আযান হচ্ছিল। এ মসজিদটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কথিত আছে যে, হযরত বাযান (রাযিঃ)—যাঁকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সনআর গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন—এখানে তাঁর একটি বাগান ছিল। বাগানটি তিনি মসজিদের জন্য ওয়াকফ করেন। তবে মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য অপর একজন সাহাবী হযরত ওয়াবার বিন ইয়াহনাস (রাযিঃ) লাভ করেন। তিনি দশম হিজরী সনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হন। তাঁর ফেরার কালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সনআয় মসজিদ তৈরী করার নির্দেশ দেন। তিনি সনআয় এসে এখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। (আল ইসাবা, পৃঃ ৬৩০, খণ্ড-৩)

এখন তো এ মসজিদ বিস্তর আয়তনে বিস্তৃত। তার একটি হল কেবলার দিকে, আরেকটি হল পিছন দিকে। উভয় হলের মাঝে সুবিস্তৃত একটি আঙ্গিনা। পিছন দিকের হলে দু'টি স্তম্ভ রয়েছে। তার একটির উপর 'মানকুরা' আর দ্বিতীয়টির উপর 'মাসমুরা' লিপিবদ্ধ রয়েছে। স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশ সেই মসজিদ, যা হযরত ওয়াবার বিন ইয়াহনাস (রাযিঃ) নির্মাণ করেছিলেন।

আমরা ইশার আযানের পর মসজিদে প্রবেশ করি। নতুনভাবে অযু করার জন্য অযুখানার দিকে অগ্রসর হয়ে দেখতে পাই যে, অযুখানার নল এবং আমাদের মাঝে একটি হাউজ প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। যা

অতিক্রম না করে নলের নিকট পৌছা সম্ভব নয়। মানুষ ঐ হাউজের মধ্য দিয়েই অবাধে আসা-যাওয়া করছিল। আমরা নল পর্যন্ত পৌছার জন্য শুকনো কোন পথ তালাশ করলাম কিন্তু পেলাম না। অবশেষে আমাদের পথপ্রদর্শক বললেন, আপনারা মোজা ইত্যাদি খুলে ঐ হাউজের মধ্যে পা রেখে চলে আসুন। আমরা অপ্রত্যাশিত এ পরিস্থিতির কারণে মূর্ত প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল, তাই পথপ্রদর্শকের নির্দেশ পালন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আমরা পানিতে পা রাখি, গোছার এক চতুর্থাংশ পানির মধ্যে হেঁটে অপর প্রান্তে পৌছি। সেখানে নল দ্বারা অযু করে পুনরায় ঐ হাউজ অতিক্রম করে মসজিদে প্রবেশ করি। পরবর্তীতে জানতে পারি যে, এ ব্যবস্থা এজন্য করা হয়েছে যে, অযুখানায় অযু করার পর মানুষ যখন খালি পায়ে হেঁটে আসে, তখন ভেজা মেঝের উপর কোন ময়লা থাকতে পারে বিধায় সতর্কতা স্বরূপ মসজিদের প্রবেশ পথে এ হাউজ তৈরী করা হয়েছে, যেন প্রত্যেকে জোর-জবরদস্তি হাউজে পা ভিজিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়।

যাই হোক! প্রাচীন এ মসজিদে নামায পড়ার এক স্বাদই ছিল অপূর্ব। নামাযান্তে ইমাম সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি মসজিদের বিভিন্ন অংশ অত্যন্ত মুহাব্বতের সঙ্গে ঘুরে দেখান। এটি এমন একটি মসজিদ, যেখানে সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ), তাবেঈন ও বুযুর্গানে দ্বীন (রহঃ) নামায পড়েছেন। যেখানে বড় বড় মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আলেমদের শিক্ষাদানের মজলিস বসেছে। এ মসজিদের পরিবেশে সে সমস্ত বুযুর্গের পবিত্র আত্মাসমূহের সুরভি আজও ছড়ানো অনুভূত হয়। ইয়ামান বড় বড় আলেমদের কেন্দ্র ছিল বিধায় অন্যান্য এলাকার আলেমগণও এখানকার আলেমদের থেকে জ্ঞানার্জানের জন্য সফর করে ইয়ামানে আসতেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ)এর এ উক্তি তো প্রসিদ্ধই রয়েছে যে—

لا بدمن صنعاء و ان طال السفر

অর্থঃ "পথ যত দীর্ঘই হোক না কেন, সনআ না গিয়ে গত্যন্তর নেই।"

সুতরাং সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আবদুর রাজ্জাক সনয়ানী (রহঃ)এর নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি সনআ ভ্রমণ করেন এবং

দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করেন।

এ মসজিদ সংলগ্ন একটি গ্রন্থাগারও রয়েছে। সেখানে প্রাচীন হস্তলিখিত বহুসংখ্যক পাণ্ডুলিপি রয়েছে। রাতের বেলায় গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা ইশার নামায পড়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসি। শায়খ আদেল তাঁর বাড়ীতে নৈশভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে আরো অনেক আলেমকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে রাতের খাবার খাই। আলেমদের সঙ্গে সেখানে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মনোমুগ্ধকর মজলিস চলতে থাকে। রাত এগারোটার দিকে আমরা হোটেলে পৌঁছতে সক্ষম হই।

সনআ থেকে প্রায় আড়াইশ' কিলোমিটার দূরে কওমে সাবা এর প্রসিদ্ধ 'মাআরিব' এলাকা। যেখানে সেই বাঁধের (সাদ্দে মাআরিব) কিছু নিদর্শন এখনও অবশিষ্ট আছে বলে লোকে বলে, যার দিকে পবিত্র কুরআন সুরায়ে 'সাবা'র মধ্যে ইঙ্গিত করেছে। আমার সেখানেও যাওয়ার বাসনা ছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল এই যে, রোববার বিকেলে আমার দেশে ফেরার জন্য বিমান বুক করা ছিল। অপরদিকে বিকাল নাগাদ সেখান থেকে ফেরা সম্ভব হবে কিনা তাতে সন্দেহ ছিল। শায়খ আবদুল মাজীদ যিন্দানী বললেন, আমার দিল চায় আপনি সেখানে যান। কিন্তু বিবেক বাধা দেয়। কারণ, পথ বেশ দুর্গম। তাছাড়া বিকাল নাগাদ ফিরতে পারবেন কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। আর ফিরতে পারলেও আমার আশংকা হয় যে, আপনি তখন বড় ক্লান্ত থাকবেন। এমতাবস্থায় সম্মুখবর্তী সফর আপনার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে। আমি মাআরিবের বাঁধ দেখার জন্য ইয়ামানে আরো সময় অবস্থান করতাম, কিন্তু পরেরদিন প্রত্যাবর্তনের জন্য কোন বিমান ছিল না, তাই ফিরতে কয়েকদিন দেরী হয়ে যাবে। আর সে সময় আমার হাতে ছিল না। তাই আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রোগ্রামটি স্থগিত করি। তবে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা মাওলানা সামীউল হক সাহেব এবং জামায়াতে ইসলামীর আমীর কাজী হুসাইন আহমাদ সাহেবকে অধিক সময় সেখানে অবস্থান করতে হবে বিধায় তাঁরা সেখানে যান।

'মাআরিবে'র পরিবর্তে সকালবেলা আমি এখানকার যাদুঘর, হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির গ্রন্থাগার এবং 'জরওয়ান' এলাকা দেখার প্রোগ্রাম

বানাই। সর্বপ্রথম আমরা সনআ নগরীর প্রাচীন যাদুঘর দেখতে যাই। যাদুঘরটি ইয়ামানের আলেম শাসক শায়খ মুরতজা কর্তৃক নির্মিত প্রাসাদ সদৃশ একটি ভবনে অবস্থিত। তাতে ইয়ামানের বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। তার মধ্যে 'সাবা' জাতি ও 'হিমইয়ারে'র নিদর্শনসমূহ ছাড়া ইসলামী যুগের বহুবিধ স্মৃতি সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু আফসোস! অনেকগুলো প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মারক সম্পর্কে জানতে পারলাম যে, তা বিভিন্ন ভিনদেশী (বরং বিধর্মী) ব্যক্তি বা যাদুঘরের নিকট বিক্রি করা হয়েছে।

যাদুঘর থেকে বের হয়ে আমরা সনআর প্রাচীন প্রাচীরঘেরা নগরীর ফটকে এসে পৌঁছি। ফটকটি আজও জাঁকজমকপূর্ণ। সম্ভবতঃ এটিই সেই ফটক, খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে পরিখা খননের সময় যেটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখানো হয়েছিল এবং ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, পৃথিবীর এই প্রাচীন নগরীটিও ইসলামের কর্তৃত্বাধীনে আসবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, তাবরানীর উদ্ধৃতিতে)

হাদীস শরীফে 'উতরুয' নামক একটি ফলের উল্লেখ এসেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তার স্বাদ উৎকৃষ্ট এবং গন্ধও উত্তম। যে ব্যক্তি নিজের ইলম দ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং অপরকেও উপকার পৌঁছায় তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'উতরুজ' ফলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমি জেনেছিলাম যে, 'উতরুজ' ইয়ামানে উৎপন্ন হয়। তাই আমি শায়খ আদেলকে অনুরোধ করে বলেছিলাম, ফলটি বাজারে পাওয়া গেলে আমি সাথে নিয়ে যাব। তিনি এখানে গাড়ী থামিয়ে বাজারে ফলটি তালাশ করলেন। জানা গেল যে, এখনও তার পূর্ণ মৌসুম আরম্ভ হয়নি। তবে এক লোক কিছু কাঁচা 'উতরুজ' নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। শায়খ আদেল 'উতরুজ' কেমন তা দেখার জন্য একটি ফল তুলে নিলেন। কাঁচা হওয়ার ফলে তার মধ্যে পরিপূর্ণ স্বাদ এখনও হয়নি, তারপরও কিছু স্বাদ হয়েছে। তবে এমতাবস্থায়ও তার সুগন্ধ ছিল বড় চমৎকার। পাকার পর তার স্বাদ ও সুগন্ধ উভয়ই যে আরো চমৎকার হবে তা নিশ্চিত।

যোহরের নামায আমরা আরেকবার 'জামেয়ুল কাবীরে' পড়ি।

নামাযান্তে অবিলম্বে পাণ্ডুলিপির গ্রন্থাগার ঘুরে দেখি। এতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল হস্তলিখিত পবিত্র কুরআনের কপিটি। এই কপি সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি হযরত আলী (রাযিঃ), হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রাযিঃ) এবং হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লিখিত হয়। একথাও প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, এটি ঐ সমস্ত কপির একটি, যা হযরত উসমান (রাযিঃ) লিখিয়ে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে পাঠিয়েছিলেন। আর এ কপিটি পাঠিয়েছিলেন সনআয়। যদিও এ কথার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই তবে এখানকার জ্ঞানীজনদের বক্তব্য হল, প্রাচীনকাল থেকে সনআবাসীদের মধ্যে এ বর্ণনাটি স্বতঃসিদ্ধরূপে বর্ণিত হয়ে আসছে। কপিটির শেষে লেখকের নাম আলী বিন আবু তালিব লিখিত রয়েছে। যার কারণে কেউ কেউ এ সংশয় প্রকাশ করেছে যে, এই লেখক হযরত আলী (রাযিঃ) নন, বরং অন্য কেউ। কারণ, যদি লেখক হযরত আলী (রাযিঃ) হতেন তাহলে 'আলী বিন আবি তালিব' লিখতেন। কিন্তু ইয়ামানের কতিপয় আলেম বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাযিঃ) নিজেকে নিজে ইবনে আবু তালিব লেখার বিষয়টি অন্য কিছু সূত্রেও প্রমাণিত রয়েছে এবং বৈকারণিকভাবেও এর ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

এ গ্রন্থাগারে প্রথম হিজরী শতাব্দী থেকে নিয়ে চতুর্থ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত লিখিত পবিত্র কুরআনের অনেকগুলো কপি সংরক্ষিত রয়েছে। তার বেশীর ভাগ হরিণের চামড়ার উপর লিখিত। তবে দেখতে তা উন্নতমানের কাগজ বলে মনে হয়। কপিগুলোর কিছু 'কুফী' বর্ণলিপিতে, কিছু 'হিময়ারী' বর্ণলিপিতে আর কিছু 'নুসখ' লিপিতেও রয়েছে। অনেক সুপ্রসিদ্ধ আলেমের স্বহস্তে লিখিত গ্রন্থসমূহও এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। তার মধ্যে হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ)এর লেখাও রয়েছে। তবে গ্রন্থকারদের মূললিপিতে লিখিত গ্রন্থসমূহ জীর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে সেগুলো পৃথক আলমারিতে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। দর্শনার্থীরা তার ফটোকপি দেখতে পারে মাত্র।

'জামইয়্যাতুল ইসলাহ' যোহরের পর নিমন্ত্রিতদের সম্মানে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করে। সনআ নগরীর উভয় পাশে পাহাড় রয়েছে।

তার একটিকে 'আইবান' আর অপরটিকে 'নকম' বলে। 'আইবান' পাহাড়ের উপর ছোট একটি বিনোদন কেন্দ্র রয়েছে, সেখানে একটি রেস্তোরাঁও রয়েছে। মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা সেই রেস্তোরাঁতেই অপূর্ব পরিবেশে করা হয়েছিল। জুন মাসের দুপুর দু'টা বেজেছিল, কিন্তু এখানকার আলো-বাতাসে এক অপূর্ব শৈত্য বিরাজ করছিল। সমস্ত মেহমান উপভোগ্য সেই পরিবেশে খুবই পরিতৃপ্ত হন।

'আসহাবুল জান্নাহর' অবস্থানস্থল 'যরওয়ানে'

সনআ নগরী থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে 'যরওয়ান' নামে একটি জায়গা রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনাসূত্রে জানা যায় যে, পবিত্র কুরআনের সূরা 'কলামে' 'আসহাবুল জান্নাহ'র যেই ঘটনা বিবৃত হয়েছে, তা 'যরওয়ানে' ঘটেছিল। সংক্ষেপে ঘটনাটি এই যে, একজন সৎ ও খোদাভীরু ব্যক্তি নানা জাতের ও বিচিত্র প্রকারের ফলবৃক্ষের সুবিস্তীর্ণ বাগান লাগিয়েছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল যে, যখন কোন ফল কাটার সময় হত, তখন তিনি সর্বপ্রথম বাগানের ফল নিজ এলাকার দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতেন। এতে করে বাগানের উৎপাদিত ফসলের বড় একটি অংশ দরিদ্রদের পিছনে ব্যয় হত।

যখন সেই ব্যক্তির মৃত্যু হল এবং বাগান তার অযোগ্য সন্তানদের হাতে চলে গেল, তখন ছেলেরা বলতে লাগল যে, আমাদের আব্বা বোকা ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। ফলে বাগানের ফসলের বড় একটি অংশ অন্যদের মধ্যে বিতরণ করতেন। আমরা নির্বুদ্ধিতার এই কাজটিকে চলতে দেবো না। সুতরাং ফসল কাটার সময় হলে তারা এমন ব্যবস্থা নিল যে, কোন দরিদ্র মানুষ যেন বাগানের নিকটেও ভীড়তে না পারে। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে তারা রাতে ঘুমাল। সকালবেলায় সম্পদের নেশায় একথা চিন্তা করে বাগানের দিকে রওয়ানা হল যে, আজ আমরা কাউকে ভাগ না দিয়ে বাগানের সম্পূর্ণ ফসল দ্বারা কেবল আমরাই উপকৃত হব। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের মন্দ নিয়তের ফলে তাদেরকে এ শাস্তি প্রদান করেন যে, রাতারাতি সম্পূর্ণ বাগানটি ধ্বংস হয়ে যায়। যখন এরা

সকালে বাগানে গেল, তখন সেখানে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

পবিত্র কুরআন ঘটনাটিকে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছে। কিন্তু এ কথা পরিস্কার উল্লেখ করেনি যে, ঘটনাটি কোথায় ঘটেছিল। যদিও কতিপয় লোক এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এটি আবিসিনিয়ার কোন এক জায়গার ঘটনা। কিন্তু বেশীর ভাগ মুফাসসিরের বক্তব্য হল, এ ঘটনাটি ইয়ামানে ঘটেছিল। হাফেজ ইবনে কাসীর (রহঃ) প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন—

كانوا من قرية يقال لها : ضروان على ستة اميال من صنعاء

অর্থ ঃ "এরা 'যরওয়ান' নামক জনপদের অধিবাসী ছিল, যা সনআ থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।"

(তাফসীরে ইবনে কাসির, পৃঃ ৪০৬, ভলিউম-৪)

'যরওয়ান' নামক জনপদটি বর্তমানেও সনআ থেকে কিছু দূরে অবস্থিত। এখানকার আলেমগণ বলেন যে, ইয়ামানে এ বিষয়টি ব্যাপক প্রসিদ্ধ যে, এটিই সেই জনপদ, যেখানকার ঘটনা পবিত্র কুরআন ' সূরা আল কলামে' বর্ণনা করেছে। আমার মনে ইচ্ছা জাগল যে, ইয়ামান থেকে যাওয়ার পূর্বে 'যারওয়ান' জনপদের সেই শিক্ষণীয় স্থানটিও দেখে যাই, পবিত্র কুরআন অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে যার বর্ণনা দিয়েছে।

সন্ধ্যা আটটায় আমার ফিরতি বিমান। আমার মেজবান আমার টিকিট ও পাসপোর্ট নিয়ে পূর্বেই বিমানবন্দরে পৌছার ওয়াদা করেছিলেন। তাই আমি ভাবলাম অবসর এ সময়টিকে কাজে লাগিয়ে 'যরওয়ান' দেখে যাই। সুতরাং আসর নামাযের পর সাড়ে পাঁচটার দিকে আমরা হোটেল থেকে রওয়ানা হই। ডঃ সালমান নদভী সাহেবও আমার সঙ্গে ছিলেন। বিমানবন্দরগামী সড়ক থেকে যখন আমরা যরওয়ানগামী সড়কে মোড় নেই, তখন সম্মুখের দিগন্তে সূর্য ঢলে পড়েছিল। আর তৎসংলগ্ন একটি পাহাড় দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। শায়খ আদেল বললেন, এটি 'যইন' পাহাড়। তিনি নির্ভরযোগ্য ওস্তাদদের নিকট শুনেছেন যে, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওয়াবার বিন ইয়াহনাস (রাযিঃ)কে সনআ নগরীতে মসজিদ নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তিনি একথাও বলেছিলেন যে, 'যইন' নামক পাহাড়ের দিকে তার

কেবলা রাখবে। এখন সূর্যের দিক থেকেও বিষয়টি সুস্পষ্ট ছিল যে, কেবলা ঠিক 'যইন' পাহাড়ের দিকে অবস্থিত।[১]

সনআ নগরী থেকে বের হওয়ার পর সড়কের উভয় দিকে ছোট ছোট পাহাড় এবং সেগুলোর মাঝখানে প্রশস্ত উপত্যকাসমূহ দেখা যাচ্ছিল। উপত্যকাসমূহে একই ধরনের ক্ষেত সুদূর বিস্তৃত ছিল। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, এগুলো 'কাত' বৃক্ষ। 'কাত' একপ্রকারের ঘাসের নাম। তার পাতা হয় লম্বা লম্বা। ইয়ামানবাসীর এটি একটি দুর্বলতা যে, পান, তামাক, ... এর মত কাত চাবানোও তাদের একটি অভ্যাস। যার কারণে তারা মারাত্মক সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। কারো কারো ধারণা এতে হালকা নেশাও রয়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের বক্তব্য, এগুলো নিছক শরীরে ফুর্তি আনার জন্য ব্যবহার করা হয়। তবে পান, তামাক ও ..... এর বিপরীতে এর বৈশিষ্ট্য এই যে, পান ইত্যাদি হাঁটাচলা অবস্থায় ও কাজের মাঝেও খাওয়া যায়, কিন্তু কাত সেবনের পিছনে অনেক সময় ব্যয় হয়। তাই ইয়ামানবাসী সাধারণতঃ আহারের পর কাত মুখে নিয়ে বসে যায় এবং ঘন্টা-ঘন্টা সময় এর পিছনেই ব্যয় করে। কতিপয় আলেম 'কাত'কে নেশাকর আখ্যা দিয়ে নাজায়েয সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেম একে নেশাকর বলে স্বীকার করেন না বটে, তবে সময় ও সম্পদ অপচয় হয় হেতু এ থেকে বারণ করেন। জানতে পারলাম যে, কাতের মূল্য অনেক বেশী। আমাদের সম্মুখে কাতের যে বিস্তৃত ক্ষেত রয়েছে, এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনেক শক্তিশালী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

প্রায় আধাঘন্টা সময় পথচলার পর গাড়ী যরওয়ানের সীমানায় প্রবেশ করে। এখানে ছোট একটি বাজার রয়েছে। 'আসহাবুল জান্নাহর' বিশেষ সেই জায়গাটি জনবসতি থেকে আরো সম্মুখে। তাই আমরা

১. পরবর্তীতে এ বর্ণনাটি আমি পেয়ে যাই। ইবনুস সাকান ও ইবনে মান্দাহ, আবদুল মালিক বিন আবদুর রহমান আয্ যামারী এর সূত্রে বর্ণনা করেন—ওয়াবার বিন ইয়াহনাসই হলেন সেই সাহাবী, যাঁকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং মসজিদের কেবলা যইন পাহাড়ের দিকে বানানেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সেখানকার লোকদের নিকট ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হই। একটি পাহাড় অতিক্রম করে নীচে নামতেই একটি বিস্ময়কর শিক্ষণীয় দৃশ্য আমাদের সম্মুখে দেখতে পাই। আর তা হল এ পর্যন্ত যে এলাকা আমরা অতিক্রম করে এসেছি, তাতে পাহাড় ও ক্ষেতের মাটি স্বভাবমাফিক মাটিরঙা ছিল, কিন্তু সেই জায়গাটি ছিল সম্পূর্ণ কালো, যেখানকার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, এখানেই সেই বাগান ছিল, যা আল্লাহ প্রদত্ত আযাবের ফলে ধ্বংস হয়েছে। এ জায়গাটি শুধু কালোই ছিল না, বরং জমিনের মধ্যে কালো কাঁটার মত এত অধিক পরিমাণ পাথরও দেখা যাচ্ছিল, যার উপর দিয়ে হাঁটাও দুস্কর ছিল। যদিও কালো পাথরের জমি পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ডেও পাওয়া যায় (পবিত্র মদীনার আশেপাশেও 'হাররা' নামে এমন কিছু জমি রয়েছে)। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণের এই জমিনের ধরন সেগুলো থেকে ভিন্নতর ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যেন, এখানে মারাত্মক আগুন লেগেছিল, যা পুরো এলাকাটিকে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছে। অনেক বিস্তৃত ও প্রশস্ত এলাকা সেই আগুনে আক্রান্ত হয়েছে। আশপাশের এলাকাসমূহেও যেহেতু অন্য কোন জমিন এ ধরনের নেই, তাই বাহ্যতঃ মনে হয় যে, এগুলো আযাবেরই নিদর্শন। যা শত শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আজও শিক্ষণীয় হয়ে আছে।

পবিত্র কুরআন কর্তৃক বর্ণিত একটি শিক্ষণীয় স্থান দেখার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছি বটে, কিন্তু এই পরিবেশে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করার সাহস আমাদের হল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযাবের স্থানসমূহ থেকে দ্রুত চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে করতে আমরা এখান থেকে চলে আসি।

বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে জামেয়াতুল ঈমানের পরিচালক শায়খ আবদুল ওয়াহাব সবান্ধবে আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। বিমানের সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে তাঁরা আমাদেরকে 'আল বিদা' জানালেন। দু' দিনের সংক্ষিপ্ত অবস্থানের পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া বহন করে আমরা ইয়ামানীয়া এয়ারলাইন্সের বিমানে আরোহণ করি।

সার্বিক প্রতিক্রিয়া

ইয়ামানে আমাদের অবস্থানকাল ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে অনেক বাসনা অপূর্ণ থাকার আক্ষেপও রয়ে যায়। আমি 'মাআরিব' যেতে পারিনি। তাছাড়া ইয়ামানের আরো কিছু এলাকাতেও যাওয়ার বাসনা ছিল। বিশেষ করে যে এলাকায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ) এবং হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাযিঃ)কে শাসক ও শিক্ষক বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, সেখানে যাওয়ার সবিশেষ আগ্রহ ছিল। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, সেই এলাকাটি ছিল দুই জেলা বা দুই প্রদেশের সমন্বয়ে। (হাদীসে এর জন্য 'মাখলাফ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে) এই পৃথক ভূখণ্ড দু'টি 'জুন্দ' ও 'যুবায়েদ' নামে আজও প্রসিদ্ধ রয়েছে। 'জুন্দ' ছিল হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ)এর কেন্দ্র। সেখানে তাঁর নির্মিত মসজিদ আজও বিদ্যমান। আর 'যুবায়েদ' হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাযিঃ)এর মাতৃভূমিও ছিল এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সেখানকারই শাসক বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। ইয়ামানের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর 'হাযরামাউত'। হযরত ওয়ায়েল বিন হাজার (রাযিঃ) সেখানকারই অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু এ তিনটি জায়গাই সনআ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এগুলো দেখার জন্য পৃথক সময়ের দরকার ছিল।

আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগে ইয়ামান বহু বড় এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। পরবর্তীতে ইয়ামান বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। যার বড় একটি অংশ 'ওমান' রাজ্য। যা নিজেই আরব উপদ্বীপের বড় একটি দেশ। (গত মাসে আমি সেখানেও গিয়েছি)। ইয়ামানেরই একটি অংশ 'নাজরান'। বর্তমানে তা সৌদী আরবের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় একটি অংশ 'আদন'। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তা বৃটেনের শাসনাধীন ছিল। পরবর্তীতে তা দক্ষিণ ইয়ামান নামে স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্রের রূপ নিয়েছিল। সেখানে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে তা পুনরায় ইয়ামানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ইয়ামানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত তার

ফযীলতের কারণে তার সঙ্গে একজন মুসলমানের হৃদ্যিক সম্পর্ক সহজাত বিষয়। বাস্তবেও ইয়ামানের সাধারণ পরিবেশে ধার্মিকতার বহিঃপ্রকাশ অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট ভাস্বর। সাধারণতঃ সেখানকার লোকদের মধ্যে নামায-রোযার গুরুত্ব, সদাচরণ ও আতিথেয়তার গুণাবলী সুস্পষ্ট পরিদৃষ্ট হয়। নারীদের মধ্যে পর্দার গুরুত্ব এখানকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। আমি আমার অবস্থানকালে সড়ক ও বাজারে একজন নারীকেও পর্দাহীন অবস্থায় দেখিনি। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক 'যায়েদী'। যাদের মধ্যে শিয়াদের হালকা ছাপ রয়েছে। এরা হযরত আলী (রাযিঃ)এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা। তবে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকেও পূর্ণ সম্মান দিয়ে থাকে। কারো সাথে গোস্তাখী করে না। তাদের ফিকহী পন্থা হানাফী মাযহাবের বেশ নিকটবর্তী। ইয়ামানে যায়েদীরা ছাড়া বিরাটসংখ্যক শাফেঈ মাযহাবের লোকেরও বাস রয়েছে এবং বহু সংখ্যক লোক আল্লামা শাওকানী (রহঃ)এর কর্মপন্থার অনুসারী। তবে কোনরূপ দলীয় সাম্প্রদায়িকতা বা মাযহাব ভিত্তিক কলহের মানসিকতা সাধারণভাবে এখানে নেই। সবাই নিজ নিজ মাযহাবমত স্বাধীনভাবে আমল করে থাকে এবং পরস্পরে ঐক্য ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে থাকে।

পূর্বকালে ইয়ামানের শাসকও আলেম হতেন। কিন্তু যখন থেকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন থেকে তাদের ঝোঁক পাশ্চাত্যমুখী। দেশের জনসাধারণ শাসকদের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। তাদের সবচে' বড় অভিযোগ হল, তারা দেশের সম্পদের সদ্ব্যবহার করে না। দেশের সম্পদকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। সম্ভবতঃ এরই পরিণতিতে ইয়ামান প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, তেল, গ্যাস ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আরব দ্বীপের সর্বাধিক পশ্চাৎপদ দেশ। এর একটি কারণ এও যে, আরব দ্বীপের অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানকার জনসংখ্যা অনেক বেশী। তবে প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার ও ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা নগরায়নিক উন্নতির দিক থেকে দেশটিকে অনেক পিছিয়ে রেখেছে।

মোটকথা, আলমে ইসলামের অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানেও জনসাধারণ ও শাসকদের মধ্যে সমঝোতার পরিবর্তে দূরত্বের এক

পারাবার প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। যার ফায়দা পুরোটাই পাচ্ছে ইসলামের দুশমনেরা। দেশের উৎকৃষ্টতম সম্পদ উম্মাতের কল্যাণ ও সফলতায় ব্যবহৃত না হয়ে অন্যদের লক্ষ্য পূরণে কাজে আসছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের পাপের কুফলকে স্বীয় দয়া ও অনুকম্পা দ্বারা বিদূরিত করে ধ্বংসাত্মক এ পরিস্থিতি থেকে যদি মুক্তি দিতেন, তাহলে মুসলিম বিশ্ব আজ সারা বিশ্বের নেতৃত্বের আসনকে অলংকৃত করত।

মালয়েশিয়ায় কয়েকদিন

গত কয়েক মাস একাধারে বহির্দেশীয় সফরে ব্যস্ত ছিলাম। কয়েকটি দেশ সফর করার পর অবশেষে এক সপ্তাহ মালয়েশিয়ায় অতিবাহিত করার সুযোগ লাভ করি। আমি প্রায় পাঁচ বছর পূর্বেও একবার মালয়েশিয়ায় গিয়েছিলাম। তবে সাম্প্রতিক কালের এ সফরে মাশাআল্লাহ ঐ দেশের উন্নতির যে জোয়ার দেখেছি এবং বিভিন্ন অঙ্গনে তার প্রশংসনীয় পদক্ষেপের যে ধারা দৃষ্টিগোচর হয়েছে, পাঠক সমাজকে তা অবহিত করতে মন চাচ্ছে। তাই এবার পাঠক সমীপে এ দেশটি সম্পর্কে কিছু কথা তুলে ধরছি।

মালয়েশিয়া দক্ষিণ এশিয়ার ঊর্ধ্বমুখী একটি ইসলামী দেশ। পূর্বে এটি 'মালায়া' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ খৃষ্ট শতাব্দীতে একে মুসলিম বিশ্বের সোনালী ভূখণ্ড মনে করা হত। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পর এটি প্রথমে পর্তুগীজ পরে ডাচ এবং অবশেষে ইংরেজ উপনিবেশবাদের শিকার হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ থেকে তার ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতা লাভের দশ বছর পর মুক্তি লাভ হয়। ১৩টি রাজ্য বা প্রদেশের সমন্বয়ের এ দেশটি স্বাধীনতা লাভের পর পার্লামেন্ট ভিত্তিক একটি কেন্দ্রীয় সংবিধান তৈরী করে। যার তৃতীয় দফায় একথা পরিস্কার উক্ত ছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ধর্ম হবে ইসলাম। তবে অন্যান্য ধর্মও শান্তিপূর্ণভাবে পালন করা যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন তেরটি রাজ্যের প্রত্যেকটির মতাদর্শিক ও সাংবিধানিক পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে সেই রাজ্যের সুলতান নিজে। আর এই তের রাজ্যের সুলতানগণ (যারা উত্তরাধিকার সূত্রে সুলতান হয়ে থাকে) নিজেদের মধ্য থেকে কোন একজনকে পাঁচ বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সরকার প্রধান নির্বাচিত করে। নির্বাচিত সেই ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরকারের আইনানুগ প্রধান হয়ে থাকে। তবে বৃটিশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের ন্যায় এ সুলতানগণও নিছক আইনানুগ প্রধান হয়ে থাকে। প্রত্যেক সুলতানের মুসলমান হওয়া

জরুরী। তারা পদ গ্রহণের জন্য শপথ বাক্য পাঠের সময় নিয়মতান্ত্রিক আরবীতে 'ওয়াল্লাহ', 'বিল্লাহ', 'তাল্লাহ' শপথবাক্য বলে অঙ্গিকার করেন যে, তারা দ্বীন ইসলামের হেফাজত করবেন।

তবে রাষ্ট্র পরিচালনার নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রী নিজে দিয়ে থাকেন। যিনি সুলতানের পক্ষ থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। তবে শর্ত হল সুলতানের মতে তাকে পার্লামেন্টের আস্থা অর্জন করতে হবে। মালয়েশিয়ায় বহু জাতির বাস রয়েছে। তার মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশের অধিক 'মালয়' বংশের লোক। তার পর দেশের অধিবাসীদের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ চীনা বংশোদ্ভূত লোকদের। তাদের বেশীর ভাগ অমুসলিম। খোদ মালয় বংশের অধিবাসীরাও বিভিন্ন বংশ ও ভৌগলিক অংশে বিভক্ত। কিন্তু অধিবাসীদের এ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এমন কোন সংঘর্ষ নেই যা দেশের শৃঙ্খলা ও সংহতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। তাদের কারো অধিকার বঞ্চিত হওয়ারও বিশেষ কোন অভিযোগ নেই, যার কারণে পারস্পরিক ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হবে। স্বাধীনতা লাভের পরপরই কিছুকাল এ জাতীয় সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। তবে শেষ পর্যন্ত একটি সুদৃঢ় রাষ্ট্র ব্যবস্থা এ সমস্ত সমস্যাকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে দেশটি দ্রুত উন্নতির সোপান অতিক্রম করছে।

মালয়েশিয়া প্রথমে টেংকু আবদুর রহমানের নেতৃত্ব লাভ করে। তিনি দেশকে উন্নতির রাজপথে এনে খাড়া করেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মাদের নেতৃত্বে সমগ্র জাতি উদ্যম ও একাগ্রতার সাথে একটি উন্নত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কয়েক বছর পূর্বে যখন আমি মালয়েশিয়া গিয়েছিলাম তখন সে দেশের সরকার জনসাধারণকে এই উদ্দীপনাকর লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিল যে, আমরা ২০২০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ পরিপূর্ণ উন্নত দেশের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই। এবার যখন পাঁচ বছর পর মালয়েশিয়া যাই, তখন প্রকৃত অর্থেই কুয়ালালামপুরের জগত পরিবর্তিত দেখতে পাই। দ্রুতগতিসম্পন্ন উন্নয়নমূলক কাজ প্রত্যেকের সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। এই সময়ের মধ্যে দেশটি শিল্পাঙ্গনে বিস্ময়কর উন্নতি করেছে। মালয়েশিয়া তার শিল্পজাত দ্রব্য দ্বারা জাপান ও কোরিয়ার মোকাবেলা করছে। শিক্ষিতের হার ৮০ শতাংশেরও অধিক।

জনসাধারণের স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে নিয়ম-শৃংখলার অনুবর্তী হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। কুয়ালালামপুর শহরকে হংকং ও সিঙ্গাপুর থেকে অধিক সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বানানো হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন (যা উচ্চতায় শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার থেকেও অধিক) কুয়ালালামপুরেই নির্মিত হচ্ছে। (মালয়েশিয়ার এ টাওয়ার আকাশচুম্বী দু'টি ভবনের সমন্বয়ে গঠিত। ভবনদ্বয়কে সুদৃশ্য একটি সেতু দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। ভবনদ্বয়ের অবকাঠামো তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন তার সাজসজ্জা ও কারুকার্যের কাজ চলছে।) ট্রান্সপোর্ট সমস্যা দূর করার জন্য ভূগর্ভস্থ ট্রেন ব্যবস্থার কাজ আরম্ভ হয়েছে।

অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির সাথে সাথে মালয়েশিয়া নিজের দ্বীন ও ধর্মের সঙ্গেও সম্পর্ক শুধু অটুটই রাখেনি বরং তাকে অধিকতর দৃঢ় করার চিন্তা অব্যাহত রেখেছে। যদিও মালয়েশিয়ার প্রায় চল্লিশ শতাংশ অধিবাসী অমুসলিম, মুসলমানদের হার অতি কষ্টে ৬০ শতাংশ হবে। চল্লিশ শতাংশ অমুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে বৃহদাংশ ঐ সমস্ত চীনা বংশোদ্ভূত অধিবাসীদের, যারা দেশীয় ব্যবসা ও শিল্পে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি রাখে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ হচ্ছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে এদিকেও বিরতিহীন অগ্রগামিতা রয়েছে।

এবার আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল সিকিউরিটিজ কমিশন। এই কমিশন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি শাখা প্রতিষ্ঠান। এটি সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক জামানতের তত্ত্বাবধান করে থাকে। সরকার এমন নীতি বাস্তবায়ন করেছে, যার অধীনে সে ক্রমশঃ সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এজন্যই সিকিউরিটিজ কমিশন ইসলামী ক্যাপিটাল মার্কেট শীর্ষক একটি আলোচনা সভা আয়োজন করেছিল। যার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এই ছিল যে, একটি ইসলামী অর্থবাজার প্রতিষ্ঠা করা কিভাবে সম্ভব? তাতে কোন ধরনের দস্তাবেজ চালু করা যেতে পারে? বিশেষতঃ মালয়েশিয়া এ কাজে কী ভূমিকা রাখতে পারে? আলোচনার উদ্বোধন করেন মালয়েশিয়ার ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টার আলহাজ আনোয়ার

ইবরাহীম। তিনি শিক্ষানুরাগ ও ধার্মিকতার জন্য প্রসিদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মাদের পর তিনি দেশের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব (কেউ কেউ তাকে দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীও বলে থাকে)। আরব বিশ্ব থেকে ডঃ ইউসুফ কারজাভী এবং পাকিস্তান থেকে এই লেখককে বিশেষভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াত করা হয়েছিল। সিকিউরিটিজ কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ মুনির আবদুল মাজীদ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে মালয়েশিয়ার সুদমুক্ত ব্যাংকিংয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন। তার সারাংশ এই ছিল যে, ১৯৮০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পদযাত্রা আরম্ভ হয় এবং ইসলামী ব্যাংক নামে এমন একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা সুদের পরিবর্তে ফিন্যান্সিং এর ইসলামী পন্থাসমূহের ভিত্তিতে কাজ করছে। একই সাথে একটি আইনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। কমার্শিয়াল ব্যাংকসমূহকে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, তারা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জন্য পৃথক শাখা প্রতিষ্ঠা করবে। সুতরাং বর্তমানে দেশের অনেক কমার্শিয়াল ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের সাথে সাথে ইসলামী কর্মপন্থা অনুপাতে কর্মসম্পাদনকারী ব্রাঞ্চ বা শাখাসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছে। ঐ সমস্ত ব্যাংকের তত্ত্বাবধানের জন্য আলেমদের সমন্বয়ে গঠিত শরীয়া বোর্ডও রয়েছে। তারা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংকের লেনদেন ও কায়কারবার পর্যবেক্ষণ করে থাকেন এবং তাদেরকে শরীয়তভিত্তিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।

সিকিউরিটিজ কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন যে, প্রথম প্রথম আমাদের এই আশংকা হয় যে, ব্যাংকিং বিষয়টি যেহেতু আধুনিক যুগের সৃষ্টি এবং বেশ জটিল, তাই আমাদের প্রাচীন ফেকাহর কিতাবসমূহে এসব ব্যাপারে যথোপযুক্ত দিকনির্দেশনা লাভ করা দুস্কর হবে, কিন্তু এদিকে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপের ফলে আমরা দেখতে পাই যে, আলমে ইসলামের শরীয়া স্কলারগণ আধুনিক মাসআলাসমূহকে কুরআন, সুন্নাহ ও ফেকাহের গ্রন্থসমূহের আলোকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে আরম্ভ করেছেন, যার ফলে ইসলামী মূলনীতির উপর গঠিত নতুন গবেষণাসমূহ দ্রুতগতিতে সম্মুখে আসছে। তিনি এ ব্যাপারে আলমে

ইসলামের অনেক আলেম ও গবেষকের লেখনীর কথা উল্লেখ করেন। যাঁরা তার মতে জ্ঞান-গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। তাঁর প্রদত্ত উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা অনুমিত হচ্ছিল যে, এঁরা ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে সমকালীন জ্ঞানী-পণ্ডিতদের লেখনীসমূহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায়ে অধ্যয়ন করছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আমার একটি ইংরেজী প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশসমূহ পাঠ করে শোনান। প্রবন্ধটি আমি পাঁচ বছর পূর্বে মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে পেশ করেছিলাম। প্রবন্ধটি মৌলিকভাবে 'সীমিত দায়িত্ব' (Limited Liability) এর বিষয়ের উপর লিখিত ছিল। জানতে পারলাম যে, প্রবন্ধটি এখানকার জ্ঞানীজনদের নিকট সবিশেষ সমাদৃত হয়েছে এবং ব্যাপক পর্যায়ে তা প্রকাশিতও হয়েছে। বর্তমানে মালয় ভাষায় তার অনুবাদও হচ্ছে।

আলোচনার পর আমাদের মেজবানগণ আমাদেরকে মালয়েশিয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করান। 'নিগারা ব্যাংক' মালয়েশিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংক। এর ডেপুটি গভর্নর ব্যাংকের ঐ সমস্ত প্রচেষ্টার কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন, যা তারা দেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রসার ঘটানোর জন্য করছেন। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই আলোচনা করেন যে, বর্তমানে যদিও প্রত্যেকটি ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব শরীয়া বোর্ড রয়েছে, যেগুলো ব্যাংকসমূহকে শরয়ী বিষয়ের দিক নির্দেশনা দান করে থাকে, কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাংকের নিজস্ব কোন শরীয়া বোর্ড নেই, যা তাকে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের সাথে লেনদেন সম্পাদনে শরয়ী দিকনির্দেশনা দান করবে। তাই বর্তমানে এমন একটি বোর্ড খোদ সেন্ট্রাল ব্যাংকের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। আর এ উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ব্যাংকের বিধিতে একটি সংশোধনী আনার প্রস্তাব মে মাসে পার্লামেন্টের সম্মুখে পেশ করা হচ্ছে।

সরকারী পর্যায়ে যাকাত সংগ্রহ ও তার বিতরণের জন্যও একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সে প্রতিষ্ঠানটিও দেখতে যাই। প্রতিষ্ঠানের প্রধান বললেন, প্রাইম মিনিষ্টার সেক্রেটারিয়েটে 'মাজলিসুশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ' (ইসলাম বিষয়ক পরিষদ) নামে একটি শাখা রয়েছে। এটি

ঐ সমস্ত ধর্মবিষয়ক প্রতিষ্ঠান থেকে ভিন্ন মর্যাদা রাখে, যা বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায় এবং তাতে সমস্ত ধর্মের ধর্মীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা হয়ে থাকে। 'মাজলিসুশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ'র উদ্দেশ্য বিশেষভাবে ইসলামী নিদর্শনাবলীর প্রয়োগ ও সে সবের প্রসার ঘটানো। এই বিভাগের পক্ষ থেকে যাকাত সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ১৯৯১ তে । এর অধীনে যাকাত উসুলের কাজ বাধ্যতামূলক তো নয়, তবে যে সমস্ত লোক এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাকাত প্রদান করতে চায় তাদেরকে যাকাতের হিসাব নিকাশ ও তা আদায় করার বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুস্তিকা, পত্রিকার প্রবন্ধ এবং রেডিও-টিভির মাধ্যমে যাকাতের গুরুত্ব জনসাধারণের সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়। সময়মত যাকাত আদায় করার প্রয়োজনীয়তা এবং তার উপকারিতা ও ফযীলত সম্পর্কে অবহিত করা হয়। উপরন্তু যারা যাকাত প্রদানের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয় তাদের যাকাতের খাত খোলা হয়। কম্পিউটারের মাধ্যমে তাদের যাকাতের হিসাব রাখা হয় এবং এই সুবিধাও প্রদান করা হয় যে, আগ্রহী ব্যক্তিরা নিজেদের বেতনের কিছু অংশ প্রতিমাসে যাকাত ফাণ্ডে এই প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করতে পারে। কম্পিউটারের মাধ্যমে তাদের প্রদত্ত অর্থের হিসাব রাখা হয়। বছর শেষে এর সম্পূর্ণ হিসাব পেশ করা হয়। যাদের যাকাতের বছর পূর্ণ হয়ে যায় তাদেরকে প্রতিষ্ঠান যাকাত প্রদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এমন গাইড বুকও প্রকাশ করা হয়েছে, যার সাহায্যে প্রত্যেক মুসলমান যাকাত-যোগ্য আসবাবের যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে। যদিও এমন একটি আইনও বিদ্যমান রয়েছে, যার ভিত্তিতে যে মুসলমান যাকাত প্রদান করবে না তাকে বন্দী করা বা জরিমানার শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। তবে বাস্তবে এমন শাস্তি কাউকে দেওয়া হয় না। কারণ এটি প্রমাণ করা মুশকিল যে, অমুক ব্যক্তি কোথাও তার যাকাত প্রদান করেনি, তাছাড়া বর্তমানে সরকারী লোকেরা উৎসাহদানমূলক ব্যবস্থাসমূহ প্রয়োগ করাকে অধিক সমীচীন মনে করছে।

১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে এই কেন্দ্রের মধ্যস্থতায় সারা দেশ থেকে ১৫৫ মিলিয়ন

মালয়েশিয়ান ডলার (রিংগিট) যাকাত উসুল হয়েছে। তার মধ্য থেকে ৩৫ মিলিয়ন উসুল হয়েছে শুধুমাত্র কুয়ালালামপুর থেকে। যাকাত সেন্টার এ অর্থ সংগ্রহ করার পর নিজে তা বিতরণ করে না। বরং ইসলাম বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে প্রতিষ্ঠিত যাকাত ফাণ্ডে জমা করে। ঐ ফাণ্ডের অধীনে প্রত্যেক প্রদেশে যাকাত বিতরণের পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। যার মাধ্যমে যাকাতের হকদারদেরকে নগদ অর্থদান ছাড়াও পেশাকর্মের মেশিন ইত্যাদি যোগান দেওয়া হয়।

মালয়েশিয়া সরকারের একটি বিরাট কৃতিত্ব—যার দৃষ্টান্ত সমগ্র মুসলিম বিশ্বে পাওয়া যায় না—তা হল তার প্রতিষ্ঠিত হজ্জ প্রতিষ্ঠান। যা মালয়েশিয়ার মুসলমানদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুসংহতভাবে হজ্জ পালনে উৎকৃষ্টতম সুবিধাদি প্রদান করছে শুধু তাই নয়, বরং সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং হাজীদের কল্যাণে অনুসরণযোগ্য ভূমিকাও এ প্রতিষ্ঠান পালন করছে। প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষণীয় অতীত কাহিনী এই—১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে ইউনিভার্সিটি অব মালায়ার একজন অর্থনীতিবিদ ইংকো আজিজের অন্তরে খেয়াল জাগে যে, মালয়েশিয়ার মুসলমানদের হজ্জ করার খুব আগ্রহ। তারা হজ্জ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের রোজগারের বড় একটি অংশ প্রতিবছর বাঁচিয়ে নিজেদের সিন্দুকে সঞ্চয় করে থাকে। হজ্জের উদ্দেশ্যে জমাকৃত ব্যক্তিগত এই সঞ্চয় বছর বছরকাল সিন্দুকে অলসভাবে (Idle) পড়ে থাকে। যেহেতু হজ্জের জন্য অর্থ সঞ্চয়কারীরা ব্যাংকের সুদ পরিহার করে থাকে, তাই তারা এ অর্থ ব্যাংকে জমা করে না। ফলে এভাবে সেই সঞ্চয়ের অর্থনৈতিক কোন উপকার তারাও লাভ করে না এবং তা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগামিতায়ও কোন সাহায্য লাভ হয় না। ইংকো আজিজের অন্তরে এই ইচ্ছা জাগে যে, কোন প্রতিষ্ঠান যদি এ সমস্ত সঞ্চয়কে সমন্বিত করে এগুলোকে এমন ব্যবসায়িক ও কল্যাণকর পরিকল্পনায় ব্যবহার করে, যা শরীয়তের দিক থেকে হালাল, তাহলে একদিকে এই পরিকল্পনার মুনাফা হাজীদের মধ্যে বিতরণ করে তাদেরকে অধিকতর দ্রুত হজ্জ আদায়ের উপযুক্ত করা যেতে পারে।

অপরদিকে ব্যবসায়িক ও উৎপাদনমুখী এ সমস্ত পরিকল্পনা দ্বারা

দেশীয় অর্থনীতির প্রসার ঘটানোও সম্ভব। ইংকো আজিজ এই চিন্তার ভিত্তিতে এমন একটি অর্থ-প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো তৈরী করেন, যা লোকদের হজ্জের উদ্দেশ্যে সঞ্চয়কৃত অর্থসমূহকে সমন্বিত করে সেগুলোকে লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে। এ অবকাঠামোটি তিনি একটি ওয়ার্কিং পেপার হিসাবে সরকারের সামনে পেশ করেন। সরকার তার এই প্রস্তাবকে পছন্দ করে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে একটি প্রতিষ্ঠান খাড়া করে—যার নাম ছিল Malayan Pilgrim Saving Corporation। এই প্রতিষ্ঠানটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, হজ্জে গমনেচ্ছুকদের থেকে তাদের সঞ্চয়কৃত অর্থ উসুল করে সেগুলোকে শুধুমাত্র এমন লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করা হবে, যা শরীয়তের দিক থেকে জায়েয এবং হালাল। যখন প্রায় ছয় বছর পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানটি সফলভাবে চলতে থাকে তখন ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে একে হজ্জ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একীভূত করা হয়। বর্তমানে এটি হজ্জ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান। যার নাম 'তাবুং হাজী'। তার আকাশচুম্বী ভবন কুয়ালালামপুরের সুদৃশ্যতম ভবনসমূহের মধ্যে গণ্য হয়।

প্রতিষ্ঠানটির কর্মপন্থা এই যে, যে ব্যক্তিই হজ্জের জন্য অর্থ জমা করতে চায় সে তার উদ্বৃত্ত টাকা এ প্রতিষ্ঠানে জমা করতে পারে। সে চাইলে তার বেতন থেকেও তার নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রতিমাসে কেটে প্রতিষ্ঠানে জমা করতে পারে। এই সংস্থায় অর্থ জমা করানোর এই সহজ পন্থাও রয়েছে যে, প্রত্যেকে নিজের নিকটতম ডাকঘরে টাকা জমা দিবে, সেখান থেকে তা সংস্থার একাউন্টে পৌঁছে যাবে। জমাকৃত এসব অর্থ থেকে বৈধ ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়। এর ফলে যে লাভ হয় তা অর্থ জমাকারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়। লাভের একটি অংশ পুনরায় সদস্যের একাউন্টে জমা হয়ে অধিকতর লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয়। একটি অংশ বোনাসরূপে সদস্যকে নগদ প্রদান করা হয়। সদস্য চাইলে এ অর্থ নিজের অন্য কোন প্রয়োজনেও ব্যবহার করতে পারে, আর চাইলে একেও হজ্জ ফাণ্ডে জমা করতে পারে। একজন সদস্যের যখন হজ্জ করতে পারে পরিমাণ অর্থ জমা হয়ে যায়, তখন হজ্জ করানোর সমস্ত ব্যবস্থাপনা 'তাবুং হাজীর' দায়িত্ব হয়ে যায়। এ সংস্থাই

সদস্যের পাসপোর্ট, ভিসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। প্রত্যেক সদস্যকে হজ্জের উন্নত প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করে। সদস্যের বাড়ী থেকে মক্কা-মদীনা যাওয়া এবং সেখান থেকে দেশে ফেরা পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভ্রমণের উন্নত ব্যবস্থা করে। পবিত্র মক্কা-মদীনায় অবস্থানকালে থাকা-খাওয়া, সেবা ও চিকিৎসা এবং হাজীদের অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনের দেখাশোনা এই সংস্থারই দায়িত্ব। জেদ্দা বিমানবন্দরে সংস্থার প্রতিনিধিদল হাজীদের অভ্যর্থনা জানায় এবং ভ্রমণের সমস্ত অফিসিয়াল কর্মকাণ্ড নিজেরা সমাধান করে। মিনা, আরাফা ও মুজাদালিফায় অবস্থান এবং হজ্জের কর্মকাণ্ড পালন করার এরাই তত্ত্বাবধান করে। যাতায়াতের জন্য ভাল যানবাহনের ব্যবস্থা করে। মোটকথা, মালয়েশিয়ার হাজীদেরকে সুশৃংখল ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনায় সফলভাবে হজ্জ করায়।

এ বিষয়টি হজ্জ ও উমরার সময় ছোট-বড় সবাই প্রত্যক্ষ করে যে, সমগ্র বিশ্ব থেকে আগত নানা বিচিত্রের হাজীদের মধ্যে মালয়েশিয়ার হাজীদেরকে সুশৃংখল ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন দেখা যায়। তারা কখনও কাউকে কষ্ট দেয় না। ধাক্কাধাক্কি করে না। কলহ-বিবাদ করতে বা উঁচু স্বরে কথা বলতেও তাদেরকে দেখা যায় না, বরং তারা নেহায়েতই প্রশান্ত ও সুশৃংখল পন্থায় নীরবে নিজেদের এবাদত পালন করে থাকে এবং একইরূপ নিয়ম-শৃংখলার সঙ্গে বিদায় হয়ে থাকে। মালয়েশিয়ান হাজীদের এ বৈশিষ্ট্য তাদের বিনম্র প্রকৃতি ও আভিজাত্যের ফল তো বটেই তবে তাতে 'তাবুং হাজীর' দেওয়া প্রশিক্ষণ এবং তাদের তৈরীকৃত সুব্যবস্থাপনারও বিরাট দখল রয়েছে।

'তাবুং হাজীর' দায়িত্বশীলগণ বলেছেন, আমাদের দেশে হজ্জের কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। এক ব্যক্তি যতবার ইচ্ছা হজ্জ করতে পারে।

'তাবুং হাজী' প্রতিষ্ঠানে হজ্জ গমনেচ্ছুকদের যে অর্থ সঞ্চিত হয় তা কত উৎকৃষ্টতম পন্থায় ব্যবহার করা হয়, তা এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এই অর্থ দ্বারা 'তাবুং হাজী' নিম্নোদ্ধৃত সাতটি বড় বড় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেছে। যার শতকরা একশ' ভাগই 'তাবুং হাজীর' মালিকানাধীন।

১. প্লান্টেশান কর্পোরেশন (পরিশোধকৃত পুঁজি পাঁচ কোটি ডলার)।

এই প্রতিষ্ঠান চল্লিশ হাজার হেক্টর ভূমিতে পাম ও কোকোর চাষ করেছে এবং পামওয়েলের দু'টি মিল প্রতিষ্ঠা করেছে।

২. সাবাহ্ প্লান্টেশান কর্পোরেশন (আদায়কৃত মূলধন প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন ডলার)। এই প্রতিষ্ঠান নয় হাজার ছয়শ' দুই হেক্টর ভূমিতে পাম ও কোকোর চাষ করেছে।

৩. প্লান্টেশান হোল্ডিং (পরিশোধকৃত মূলধন প্রায় ছাব্বিশ লাখ ডলার)। এই প্রতিষ্ঠান দুই হাজার পাঁচশ'-একত্রিশ হেক্টর ভূমিতে পাম চাষ করেছে।

৪. জেনারেল ট্রেডিং কোম্পানী (পরিশোধকৃত মূলধন দুই মিলিয়ন ডলার)। এই প্রতিষ্ঠান টিকিট এজেন্সী ও সাধারণ ব্যবসা করে থাকে।

৫. কন্সট্রাকশান এণ্ড হাউজিং কোম্পানী (পরিশোধকৃত মূলধন বিশ মিলিয়ন ডলার)। এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্টের কাজ করে থাকে।

৬. প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী (পরিশোধকৃত মূলধন দুই লাখ ডলার)।

৭. প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী (পরিশোধকৃত মূলধন দশ মিলিয়ন ডলার)।

এই সাতটি কোম্পানী (যেগুলোর সর্বমোট পরিশোধকৃত মূলধন প্রায় একশ' নয় মিলিয়ন মালয়েশিয়ান ডলার) সম্পূর্ণটাই একচেটিয়া হজ্জ প্রতিষ্ঠানের মালিকানা। এর সম্পূর্ণ মুনাফা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সদস্যরা লাভ করে থাকে। এছাড়া দেশের ১৯টি বড় বড় কোম্পানীতে তাবুং হাজীর শেয়ারের অনেক বড় একটি সংখ্যা রয়েছে। তার মধ্য থেকে অনেকগুলো কোম্পানী এমন রয়েছে, যেগুলোর দশ শতাংশেরও অধিক শেয়ার হোল্ডিং তাবুং হাজীর। এগুলোর বোর্ডে তাবুং হাজীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। তাছাড়া হজ্জের সফর সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড এ প্রতিষ্ঠানই ব্যবসার ভিত্তিতে সম্পাদন করে থাকে। সারাদেশে এ প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কারো হজ্জের সফরের ব্যবস্থাপনা করার অনুমতি নেই বিধায় হাজীদের সফরসেবার ভিত্তিতে যে আমদানী হয়ে থাকে তাও প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতায় সদস্যদের মধ্যেই বন্টন হয়ে থাকে। তাছাড়া এ প্রতিষ্ঠান

জায়গা–জমি ক্রয়–বিক্রয়ের মাধ্যমেও মুনাফা করে থাকে। উপরন্তু ইউনিট ট্রাষ্টের মাধ্যমে অন্যান্য কোম্পানীর শেয়ার কেনাবেচার দ্বারাও এটি উল্লেখযোগ্য লাভ পেয়ে থাকে। প্রসিদ্ধ একটি ব্যাংকের চিফ এক্সিকিউটিভ একটি নৈশভোজে আমার নিকট একথা স্বীকার করেন যে, দেশের কোন ব্যাংক বা অর্থ প্রতিষ্ঠানই তাদের সদস্যদের মধ্যে এত অধিক মুনাফা বন্টন করে না, যত মুনাফা বন্টন করে 'তাবুং হাজী'।

১৯৯৪ খৃষ্টাব্দের সর্বশেষ প্রকাশিত সংখ্যা ও গণনা অনুপাতে সে সময়ের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৫ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার। তাবুং হাজীর সমস্ত লাভজনক পরিকল্পনা থেকে প্রাপ্ত মোট লভ্যাংশ ছিল (ট্যাক্স বাদে) ২১ কোটি ৪২ লক্ষ ৫২ হাজার মালয়েশিয়ান ডলার। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, এই বিশাল পরিকল্পনা শুধু হজ্জকারীদেরকেই নয়, বরং পুরো দেশীয় অর্থনীতিকে কেমন অতুলনীয় লাভ দিয়েছে।

তাবুং হাজীর বিশাল ভবনের অডিটোরিয়ামে যখন একটি রেকর্ডকৃত ভাষণ আমাদেরকে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ বলছিল, তখন আমি ভাবছিলাম যে, হজ্জ প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত এই ফলাফল এমন একটি দেশের, যার অধিবাসী সোয়া কোটির অধিক নয়। অধিক অধিবাসীর মুসলমান দেশসমূহ যেমন পাকিস্তান—যার অধিবাসী তের কোটির কাছাকাছি এবং যেখানকার হজ্জকারীদের সংখ্যা মালয়েশিয়ান হাজীদের থেকে অনেক বেশী—যদি এ জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাহলে শুধু হজ্জ পালন করাই সহজ হবে না, বরং এ পরিকল্পনা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতেও অনেক বড় ভূমিকা পালন করতে পারবে। আমি এ কথা মাত্র চিন্তা করছি, এমন সময় আমার কানে রিপোর্ট পেশকারী ভাষণদাতার এই কথা শ্রুত হয়—'আমরা অন্যান্য মুসলিম ভ্রাতৃদেশসমূহকে এ প্রস্তাব করেছি যে, যদি তারা নিজেদের দেশে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান খাড়া করে তাহলে তাবুং হাজী তার অভিজ্ঞতার আলোকে তাদেরকে সহযোগিতা করে আনন্দবোধ করবে'। তবে এ পরিকল্পনা দ্বারা যথার্থ উপকার লাভের জন্য সর্বপ্রথম নিষ্ঠা, দ্বিতীয়তঃ শ্রম ও অধ্যাবসায় এবং তৃতীয়তঃ আমানত ও দিয়ানত একান্তই প্রয়োজনীয়। আমার অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত দু'আ বের হল যে,

মহান আল্লাহ যদি আমাদের দেশকেও এই মৌলিক তিনটি নেয়ামত দান করতেন তাহলে আমাদের দিন পাল্টে যেত।

তাবুং হাজীর পর আমরা কুয়ালালামপুরের আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও যাই। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৯০টি দেশের দশ হাজার ছাত্র শিক্ষারত রয়েছে। ৪০টি দেশের ওস্তাদগণ পাঠদান সেবা প্রদান করছেন। প্রচলিত সমস্ত জ্ঞান–বিজ্ঞানের সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান–বিজ্ঞানের শিক্ষাদান ব্যবস্থাও এতে রয়েছে। শিক্ষাদানের সার্বিক পরিবেশে ইসলামী রুচি ও প্রকৃতি সজীব করার প্রয়াস পাওয়া হয়। পরিচালকদের বক্তব্য হল, এখানে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক পরিচর্যার প্রতিও সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টির নতুন ক্যাম্পাস তৈরীর জন্য দ্রুত কাজ চলছে। এ ক্যাম্পাসটি তিন হাজার একশ' পঞ্চাশ বর্গকিলোমিটারে বিস্তৃত। এটি নির্মাণে চারশো মিলিয়ন আমেরিকান ডলার ব্যয় হবে। এর হোষ্টেলে পনেরো হাজার ছাত্রের বসবাসের ব্যবস্থা রয়েছে। এক হাজার আবাসিক ইউনিট বিবাহিত ছাত্রদের জন্য রাখা হয়েছে। এর লাইব্রেরী দশ লক্ষ গ্রন্থ সমন্বিত। বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনকালে ইসলামী অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র, শিক্ষক ও স্কলারদের সম্মুখে বক্তব্য দানেরও সুযোগ লাভ হয়। বক্তব্য শেষে ছাত্রদের প্রশ্ন দ্বারা তাদের বিদ্যানুরাগিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

এটি ছিল এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, যেগুলো মালয়েশিয়ার বর্তমান সফরকালে আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে আপত্তিকর অনেক বিষয়ও নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছি এবং সেগুলো সংশোধনেরও বিরাট সুযোগ পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে মোটের উপর মালয়েশিয়া যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে, তা অনেকটাই আশাব্যাঞ্জক ও মুসলিম বিশ্বের জন্য তৃপ্তিজনক। এদেশ আমাদের থেকে দশ বছর পর স্বাধীনতা লাভ করেছে, কিন্তু তার উন্নতির গতি আমাদের জন্য ঈর্ষণীয়।

এতে সন্দেহ নেই যে, তার অধিবাসী আমাদের তুলনায় অনেক কম এবং উপাদান–উপকরণ অনেক বেশী। এই উন্নতির পিছনে এই দিকটির ভূমিকাকে চোখের আড়াল করা সম্ভব নয় ঠিক, তবে এর চেয়ে বড় কারণ

দেশের রাজনৈতিক দৃঢ়তা, তৎপরতা ও চিন্তাশীল নেতৃত্ব এবং জাতীয় ঐক্য। এখানেও বিভিন্ন জাতির লোকের বাস রয়েছে, এখানেও বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা হয়, এখানেও বিভিন্ন ধর্মের লোক বসবাস করে থাকে, এখানেও রাজনৈতিক দলসমূহ নিজ নিজ কর্মসূচী নিয়ে বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তাদের মতবিরোধ—চাই তা রাজনৈতিক হোক বা গোত্রীয়, ধর্মীয় হোক বা দলীয়—তা পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতার রূপ লাভ করে না এবং দেশের ব্যাপকতর স্বার্থের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

রাতের সূর্য

পৃথিবীর উত্তর প্রান্তের একটি ভ্রমণ
নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড

রাত বারোটা বাজে। তখনও দিগন্তে সূর্য বিদ্যমান। দেদীপ্যমান সূর্য পরিবেশকে আলোয় উদ্ভাসিত করে রেখেছে। আমরা উত্তরে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে অবস্থান করছি। সূর্যকে সামনে নিয়েই পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তে এশার আযান দিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করলাম।

জীবনের বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী এ অভিজ্ঞতা আমার সাম্প্রতিক কালের নরওয়ে সফরে লাভ হয়। স্মরণীয় এ ভ্রমণ—যাতে আমি নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড ভ্রমণ করি—অনেক নতুন অভিজ্ঞতা এবং নতুন তথ্যসমৃদ্ধ। তাই পাঠককেও এই ভ্রমণের কিছু বৃত্তান্ত অবহিত করতে মন চাইল। এ উদ্দেশ্যেই এ লাইনগুলো পেশ করছি।

ইউরোপের উত্তরে দ্বীপসদৃশ একটি ভূখণ্ড রয়েছে, যাকে Scandinavian Peninsula বলে। প্রাচীন ইতিহাসে একে 'স্ক্যানডিয়া' বলা হত। এ উপদ্বীপটি এক হাজার একশ' পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ। তার মোট আয়তন দুই লক্ষ ঊননব্বই হাজার পাঁচশ' বর্গমাইল। এর কিছু অংশ সুইডেন আর কিছু নরওয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই উপদ্বীপের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেই ইউরোপের উত্তরের তিনটি দেশ নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের সমষ্টিকে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া Scandinavia বলা হয়। কতিপয় লোক ফিনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড ও ফিরু দ্বীপপুঞ্জকেও ভৌগলিক সাদৃশ্যের কারণে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। কিন্তু নির্ভেজাল ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার মধ্যে নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ককেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে কিছু দিন ধরে অপর একটি পরিভাষা 'উত্তরের দেশমালা' (Nordic Countries) ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া দেশসমূহ ছাড়া ফিনল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এসব দেশের মধ্যে নরওয়ে উত্তরের অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক

উত্তরে। নরওয়ের দক্ষিণ প্রান্ত উত্তরে সাতান্ন ডিগ্রী অক্ষাংশে আর উত্তর প্রান্ত সাতশ' একুশ ডিগ্রী অক্ষাংশে অবস্থিত। বরং সাদ্দুল বার্দ দ্বীপপুঞ্জ—যা নরওয়ের ব্যবস্থাধীনে রয়েছে—(যার আলোচনা ইনশাআল্লাহ সামনে করব) তার শেষ প্রান্ত একাশি অক্ষাংশে অবস্থিত। অর্থাৎ উত্তর মেরু থেকে মাত্র নয় ডিগ্রী দূরে।

নরওয়ের মোট আয়তন এক লক্ষ পঁচিশ হাজার সাতান্ন বর্গমাইল। এ সম্পূর্ণ অঞ্চলটি অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দয, পাহাড়, সাগর, জলপ্রপাত ও ঝিলসমূহ দ্বারা সমৃদ্ধশালী। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার বক্তব্য অনুযায়ী নরওয়ের ছোট বড় ঝিলের মোট সংখ্যা এক লক্ষ ষাট হাজার। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ দেশটিকে বহুবিধ উপকরণ দান করেছেন। যার মধ্যে তেল, গ্যাস, লাকড়ি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এত বেশী বিস্তৃত আয়তন আর এত অধিক উপাদান থাকা সত্ত্বেও এর সর্বমোট অধিবাসী পাঁচ মিলিয়ন (পঞ্চাশ লক্ষ)এর কাছাকাছি। অধিবাসীর ঘনত্ব (Density) প্রতি কিলোমিটারে তেরোজন। তাই যখন নরওয়ে কর্তৃক তার অধিবাসীদেরকে প্রদত্ত সুবিধাদি—যেমন বিনা বেতনে শিক্ষা, বিনামূল্যে চিকিৎসা, ফ্যামিলি এলাউন্স, বার্ধক্য ও পঙ্গুত্বের পেনশন ইত্যাদির আলোচনা আসে, তখন এর কারণও সহজেই বুঝে আসে। সুতরাং অতি সম্প্রতিই জাতিসংঘের গণনা অনুযায়ী নরওয়েকে উন্নত জীবনযাত্রার দিক থেকে বিশ্বের এক নম্বর দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

নরওয়ের মুসলমানদের নিমন্ত্রণে গত বছর (২০০০ সাল) আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে আমি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ভ্রমণ করি। সেটি ছিল নিমন্ত্রণধাঁচের একটি ভ্রমণ। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার মুসলমানদের জন্য ইসলাহী বয়ান করা, তাদের সমস্যাবলী অবগত হওয়া, সেসবের সমাধানের জন্য পরামর্শ দেওয়া এবং তাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করা। সুতরাং নরওয়ের রাজধানী ওসলোতে আমার অনেকগুলো বয়ান হয়। এখানকার বিভিন্ন মসজিদ ছাড়া বড় একটি হলে ৬ই আগষ্ট ২০০০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের বড় একটি সমাবেশেও আমার বক্তব্য হয়। তার শিরোনাম ছিল 'অমুসলিম দেশসমূহে বসবাসকারী মুসলমানদের দায়িত্ব।' সাথে সাথে ৮ই আগষ্ট নগরীর বড় একটি সেন্টারে ডাক্তারদের বড় এক

সমাবেশেও বক্তব্য দানের সুযোগ হয়। তাতে মুসলমানগণ ছাড়া স্থানীয় অমুসলিম ডাক্তারগণও বিরাট সংখ্যক উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্যটি ইংরেজীতে হয়েছিল।

এই সমাবেশের ব্যবস্থা মুসলমান ডাক্তারদের অনুরোধে এজন্য করা হয়েছিল, যেন মুসলমানদেরকে হাসপাতালের ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ অবহিত করা হয়। বহুসংখ্যক অমুসলিম ডাক্তারকেও এজন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল যে, তারা যেন মুসলমানদের ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ সম্পর্কে অবগত হয়ে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় প্রয়োজন ও কর্তব্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারে। সমাবেশের আলোচ্য বিষয় এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও আমি এ সুযোগকে গণীমত মনে করে প্রথমে ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তার মৌলিক আকিদা ও শিক্ষার একটি রূপরেখা তুলে ধরি। তারপর রোগ, রোগী ও তার চিকিৎসা সংক্রান্ত শরীয়তের বিধি-বিধান কিছুটা সবিস্তারে বর্ণনা করি। হলকক্ষ ডাক্তারদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তাদের মধ্যে অমুসলিমদের সংখ্যা ছিল বেশী। ওসলো শহরের গভর্নরও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সুধীজনদের প্রশ্নসমূহ দ্বারা অনুমিত হয় যে, তারা পূর্ণ আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে এ বক্তব্য শ্রবণ করেন। অমুসলিম ডাক্তারদেরকে মুসলমান রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদের ধর্মীয় বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখায় সচেষ্ট হওয়ার প্রতি আগ্রহী দেখা গেল। সমাবেশ সমাপ্ত হওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত প্রশ্নের ধারা চলতে থাকে। উপস্থিত অনেকেই বললেন যে, তাদের বিভিন্ন সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত হয়েছে।

কিছুদিন ধরে নরওয়ের স্কুলসমূহে খৃষ্টধর্ম শিক্ষা সকল শিশুর জন্য আবশ্যকীয় করা হয়েছে। মুসলমান শিশুরাও এর ব্যতিক্রম নয়। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য এখানকার মুসলমানগণ মধ্যপন্থী কিছু খৃষ্টান পাদ্রীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে। ৮ই আগষ্ট ২০০০ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানী মুসলমান সিদ্দীকী সাহেবের রেস্তোরাঁয় এ সাক্ষাত হয়। এদিক থেকে আমাদের সাক্ষাতটি উপকারী হয় যে, উপস্থিত সকল পাদ্রী একথা স্বীকার করেন যে, মুসলমানদেরকে খৃষ্টধর্ম শিক্ষা করতে বাধ্য করা একান্তই বাড়াবাড়ি। তারা এ বাধ্যবাধকতাকে রহিত করতে মুসলমানদের

সঙ্গে সহযোগিতা করবেন বলে ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

ওসলোতে মুসলমান শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য একটি মুসলিম স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছিল। আমি পশ্চিমা দেশসমূহের ভ্রমণে এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করার প্রতি সর্বদাই জোর দিয়ে আসছি। এই স্কুলের ব্যবস্থাপকগণ পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরামর্শ নেওয়ার জন্য আমাকে দাওয়াত করেছিলেন। সেখানেও যাই। আমি পাঠ্যক্রম প্রস্তুতিতে সামর্থানুযায়ী তাদেরকে সাহায্য করি। পাকিস্তান আসার পরও তাদের পক্ষ থেকে পত্রযোগে পরামর্শ গ্রহণের ধারা অব্যাহত থাকে।

ওসলো থেকে একদিনের জন্য আমি ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনেও যাই। এখানে মাওলানা সুলতান ফারুকের পরিচালনাধীন ইসলামিক কালচার সেন্টারের মসজিদে জুমুআর নামাযান্তে দীর্ঘসময় বক্তব্য দান করি। তারপর একদিনের জন্য সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহোমেও যাওয়া হয়। সেখানে চৌধুরী মুহাম্মাদ আখলাক সাহেবের ব্যবস্থাধীনে স্থানীয় একটি মসজিদে একটি সাধারণ সভায় বক্তব্য দান ও প্রশ্নোত্তরের আসর হয়।

গতবছর আমার এ ভ্রমণের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আমার প্রিয় বন্ধু ডঃ খালেদ সাঈদ সাহেব করেছিলেন। তিনি ওসলোর মুসলমানদের মধ্যে অতি পরিচিত ব্যক্তিত্ব। আমি সর্বদাই তাঁর মধ্যে আবেগ ও বিবেকের উত্তম সংমিশ্রণ দেখতে পেয়েছি। তাঁকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কিন্তু রুচিশীল, গম্ভীর কিন্তু তৎপর পেয়েছি। ভ্রমণকালীন প্রোগ্রামসমূহের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমাকে ওসলো ও তার উপকণ্ঠের ভ্রমণ করান। নরওয়ের জলবায়ু, গ্রীষ্মকালীন ঋতু এবং এখানকার প্রশান্ত পরিবেশ পাশ্চাত্য জগতের অন্য যে কোন দেশের তুলনায় আমার কাছে অধিক পছন্দ হয়। এখানে অবস্থানকালে আমার স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি ঘটে।

সুতরাং এ বছর আমার কতিপয় চিকিৎসক যখন আমাকে আমার নিয়মতান্ত্রিক কর্মব্যস্ততা থেকে অবসর হয়ে কমপক্ষে দু' সপ্তাহ কোন ভাল আবহাওয়াপূর্ণ জায়গায় কাটানোর জন্য তাকীদ করেন, তখন আমি এর জন্য নরওয়েকে সর্বাধিক উপযুক্ত মনে করি। আমার বন্ধু ডঃ খালেদ সাঈদ সাহেব পূর্বেই আমাকে পীড়াপীড়ি করে বলেছিলেন যে, গ্রীষ্মকালে

কিছুদিন যেন আমি সেখানে কাটাই। তাই এ বছর আমি আল্লাহর নামে সংকল্প করি যে, দারুল উলূমের ষান্মাসিক পরীক্ষা চলাকালে দু' সপ্তাহ নরওয়ে ও তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে অতিবাহিত করব। ১৬ই জুলাই ও পহেলা আগষ্ট আমাকে লণ্ডনে দু'টি সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে হবে। এই সমাবেশদ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়টুকু নরওয়েতে অতিবাহিত করার জন্য পেয়ে যাই।

১৬ই আগষ্ট লণ্ডনে ফার্ষ্ট ইসলামিক ইনভেষ্টমেন্ট ব্যাংকের শরীয়া বোর্ডের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার পর আমি ১৭ই আগষ্টের তৃতীয় প্রহরে নরওয়ের রাজধানী ওসলো পৌঁছি। আমার মেজবান বন্ধু ডঃ খালেদ সাঈদ সাহেব, মাদানী মসজিদের ইমাম ও খতীব জনাব মাওলানা বশীর সাহেব এবং নরওয়েতে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত স্বাগত জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমার পরিবারও যেহেতু এ সফরে আমার সঙ্গে ছিলেন তাই ওসলোর উপকণ্ঠের একটি এলাকায় (Mortensrud)—যেখানে বহুসংখ্যক পাকিস্তানী লোকের বসবাস রয়েছে—একটি খালি বাড়ীতে ডঃ খালেদ সাঈদ সাহেব আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

ঐ দিনের বিকেল ৬টায় মাওলানা বশীর সাহেব মাদানী মসজিদে ওসলোর আলেমদের একটি সমাবেশ আহবান করেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, ওসলো শহরে বর্তমানে ১৫/২০টি মসজিদ রয়েছে। তার কিছু পাকিস্তানী ইমামদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে, আর কিছু রয়েছে আরব উলামাদের তত্ত্বাবধানে। মাওলানা বশীর সাহেব এ সময় সমস্ত মসজিদের ইমাম ও খতীবগণকে সমবেত করেছিলেন। তার মধ্যে ইরাকের শায়খ বারযাঞ্জী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমি গত বছরেও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলাম। তাঁর মসজিদে আরবীতে আমার বক্তব্যও হয়েছিল। তিনি একজন বিদ্যানুরাগী ও অধ্যয়নপাগল মহান ব্যক্তি। তিনি ছাড়া সোমালিয়ার কিছু ইমাম ও খতীবও এ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশের উদ্দেশ্য ছিল এখানকার ফেকাহ বিষয়ক কিছু সমস্যা নিয়ে পরামর্শ করা। এ কার্যক্রম প্রায় এক ঘন্টা সময় অব্যাহত থাকে। যে সমস্ত নারী তাদের স্বামীদের জুলুম-নির্যাতনের

শিকার হয়ে বিবাহ ভঙ্গ করাতে চায়, তাদের বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনায় আসে। এ ব্যাপারে আমি প্রস্তাব পেশ করি যে, এখানকার মসজিদের ইমামদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হোক, যারা এসব নারীর অভিযোগ শুনবে। শরীয়তে এ সুযোগ রয়েছে যে, যেসব দেশে মুসলমান বিচারপতি নেই সেখানে মুসলমানদের একটি দল এ জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে বিচারপতির স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করবে। যার বিস্তারিত পদ্ধতি হাকিমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)এর 'আলহীলাতুন নাজিযাহ' গ্রন্থে রয়েছে।

আমার এই প্রস্তাবে সবাই একমত হন। আলহামদুলিল্লাহ, ঐ বৈঠকেই একটি কমিটি গঠন করা হয়, যা এ সমস্যার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, বরং মুসলমানদের অন্যান্য সমস্যার ব্যাপারেও পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করবে।

আসরের নামায ঐ সময় সেখানে বিকাল সাড়ে সাতটায় হচ্ছিল। সুতরাং সমাবেশান্তে আসর নামায আদায় করা হয়। নামাযের পরও কিছু সময় পর্যন্ত প্রশ্নোত্তরের ধারা চলতে থাকে। সাড়ে আটটার দিকে আমি সেখান থেকে আমার অবস্থানস্থলে ফিরে আসতে সক্ষম হই। সে সময় সেখানে সূর্যাস্ত হচ্ছিল সাড়ে দশটায়। তাই মাগরিবের সময় হতে তখনও দু' ঘন্টা বাকী ছিল। এ সময়টুকু আমি আমার অবস্থানস্থলে মাআরিফুল কুরআনের অনুবাদের কাজে ব্যয় করি।

ওসলোর রজনী

সাড়ে দশটার সময় সূর্যাস্ত হলে আমরা মাগরিব নামায আদায় করি। কিন্তু ওসলোর অবস্থা এই যে, গ্রীষ্মকালের পুরো মৌসুমে এখানে সূর্যাস্তের রক্তিম আভা সারারাত অস্ত যায় না। বরং প্রায় সারারাত এমন আলো-আঁধারী অবস্থা বিরাজ করে, যেমন আমাদের দেশে মাগরিব নামাযের আধাঘন্টা/পৌনে এক ঘন্টা পর কিংবা সুবহে সাদিক হওয়ার আধাঘন্টা পর হয়ে থাকে। রাত যতটাই হোক না কেন আকাশে পরিষ্কার আলো দেখা যায়। অধিকাংশ সময় দিগন্তের লালিমাও বিলুপ্ত হয় না। এর কারণ এই যে, এখানে রাতের কোন সময়েই সূর্য দিগন্ত থেকে আঠার

ডিগ্রীর নীচে যায় না। বরং উত্তর-পশ্চিমে অস্ত গিয়ে উত্তর-পূর্বে উদিত হয়।

শরীয়তের বিধান মতে এশার সময় আরম্ভ হয় তখন, যখন দিগন্তের সন্ধ্যাকালীন শুভ্রতা কিংবা ন্যূনতম পক্ষে সন্ধ্যাকালীন লালিমা অস্ত যায়। যেহেতু ওসলোতে সম্পূর্ণ গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যাকালীন শুভ্রতা ও লালিমা অস্ত যায় না, তাই স্বভাবতই এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এশার পরিচিত ও স্বাভাবিক সময় এখানে হয় না।

নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডে তো এ অবস্থা গ্রীষ্মকালীন পুরো মৌসুমে (৭ই এপ্রিল থেকে ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) অব্যাহত থাকে, তবে ইউরোপের আরো কিছু দেশেও গ্রীষ্ম ঋতুতে কিছু সময় এমন আসে, যখন রাতে লালিমা অস্ত যায় না এবং এশার মূল সময় আসে না। যেমন লণ্ডনে ২৫শে মে থেকে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত, এ্যাডেনবরা ও গ্লাসগোতে ৫ই মে থেকে ১৭ই আগষ্ট পর্যন্ত এবং প্যারিসে ১১ই জুন থেকে ১লা জুলাই পর্যন্ত সান্ধ্যলালিমা অস্ত যায় না।

প্রশ্ন হল, এ সমস্ত জায়গায় এশা ও ফজরের নামায কখন পড়া হবে? এশার যথার্থ সময় তো এজন্য আসে না যে, সান্ধ্যলালিমা সারারাতই রয়ে যায়। ফজর নামাযের মাসআলাও এজন্য ভাববার বিষয় যে, ফজরের সময় আরম্ভ হয় সুবহে সাদিক উদয় হলে। আর সঠিক অর্থে সুবহে সাদিক উদয় হয়েছে তখন বলা হবে, যখন তার পূর্বে পূর্ণ অন্ধকার আচ্ছন্ন করবে। কিন্তু এখানে তো পূর্ণ অন্ধকার সারা রাতের কখনই হয় না, তাই সুবহে সাদিক কখন আরম্ভ হল সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও জটিল ব্যাপার।

এমন এক সময় ছিল, যখন এ সমস্ত এলাকায় মুসলমানদের বসবাস ছিল না। তাই এ সমস্যার বাস্তবভিত্তিক কোন গুরুত্বও ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের অধিবাস্ উত্তরে আটচল্লিশ অক্ষাংশের সম্মুখে যতই অগ্রসর হতে থাকে, এ প্রশ্ন ফকীহদের সামনে ততই জোরালোভাবে আসতে থাকে এবং এ ব্যাপারে উম্মাতের আলেমগণ বিস্তারিত আলোচনাও করেন।

'বুলগার'-পরিচিতি

আমার জানা মতে এ মাসআলাটি সর্বপ্রথম আব্বাসী খেলাফতকালে উত্তরের 'বুলগার' শহরে দেখা দেয়। শহরটি ৫৫ ডিগ্রী অক্ষাংশ ও ৬৬ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। 'মুক্তাদির বিল্লাহে'র শাসনকালে 'বুলার' নামক একজন মুসলমান বুযুর্গ ঐ শহরে পৌঁছে দেখতে পান যে, শহরের রাজা ও রানী উভয়ে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। জীবনের ব্যাপারে তারা নিরাশ। 'বুলার' তাদেরকে বললেন, আমি আপনাদের চিকিৎসা করলে আপনারা কি আমার ধর্ম (ইসলাম) কবুল করবেন? তারা সম্মতি জানায়। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তাঁর চিকিৎসায় রাজা ও রানী উভয়ে সুস্থ হয়ে ওঠেন। তখন বুলারের হাতে তাঁরা মুসলমান হন। তাঁরা মুসলমান হওয়ার ফলে শহরের সমস্ত মানুষ ইসলাম কবুল করেন। তাঁরা মুকতাদির বিল্লাহর নিকট পয়গাম পাঠান যে, আমাদের নিকট এমন কোন লোক পাঠিয়ে দিন, যিনি আমাদেরকে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা দিতে সক্ষম।

বুলগারের অদূরবর্তী 'খজর' এলাকার রাজা ছিল অমুসলিম। সে বুলগারের রাজা ও তার অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পেয়ে নির্ভীক এক সেনাদল নিয়ে বুলগারের উপর আক্রমণ করে। বুলার বুলগারের লোকদেরকে বলেন যে, 'তোমরা ভয় করো না। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে শত্রুপক্ষের মোকাবেলা কর।' এভাবে উভয় দলের মধ্যে লড়াই হয়। খজরের বাদশাহ পরাস্ত হয়। পরবর্তীতে সে বুলগারের শাসকের সঙ্গে সন্ধি করে। তখন সে বলে যে, যুদ্ধ চলাকালে আমি আপনাদের বাহিনীতে লালরঙ্গের অশ্বে আরোহিত অস্বাভাবিক বড় কিছু লোক দেখতে পাই। তারা আমার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করছিল। বুলার বললেন, 'এঁরা আল্লাহর প্রেরিত বাহিনী।' এ সম্পূর্ণ শহরটি যেহেতু বুলারের দাওয়াতে মুসলমান হয়েছিল তাই এই শহরের নামও 'বুলার' রাখা হয়। যা কালক্রমে 'বুলগার' হয়ে যায়। [১]

---

১. এ ঘটনাটি আল্লামা কাযবিনী (রহঃ) আসারুল বিলাদ ওয়া আখবারুল ইবাদ (পৃঃ ৬১২-৬১৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। বুলগারেরই অধিবাসী মাহমুদ আর রামযী ১২৪৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত এর বিস্তারিত ইতিহাস লিখেছেন। যা ১৩২৫ হিজরীতে 'তালফিকুল আখবার ওয়া তালকিহুল আসার' নামে ছেপে বের হয়েছে।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক কালাকসান্দী (রহঃ) বুলগারের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, 'বুলগারের অধিকাংশ অধিবাসী হানাফী মাযহাবের অনুসারী। সেখানে তীব্র শীতের কারণে কোন প্রকার ফল বা ফলবৃক্ষ হয় না। .... সুলতান ইমাদুদ্দীন হামভী বলেন যে, বুলগারের কতিপয় অধিবাসী আমাকে বলেছেন যে, গ্রীষ্মের শুরুতে সেখানে সান্ধ্য-লালিমা অস্ত যায় না। সেখানকার রাত খুব ছোট হয়। ..... কারণ ৪৮.৫ ডিগ্রি অক্ষাংশ ও তারও সম্মুখের অঞ্চলসমূহে গ্রীষ্মের শুরুতে সান্ধ্যলালিমা অস্তমিত হয় না। (সুবহুল আ'শী, পৃঃ ৪৬২০, খণ্ড-৪)

স্মর্তব্য যে, এ শহরটি এখনও এ নামেই পরিচিত। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী তাতারীস্থানের কাজান শহর থেকে ২৪৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী শায়খ নাসির আল উবুদী এ দেশ সফর করেন। তাঁর সফরনামা 'বিলাদুত তাতার ওয়াল বুলগার' নামে প্রকাশিতও হয়েছে। তিনি বলেন যে, এখনও সরকারী কাগজপত্রে এ শহরকে 'বুলগারই' বলা হয়। এখানে বড় বড় আলিমের জন্ম হয়েছে।

সারকথা এই যে, বুলগারে ইসলাম বিস্তারের ফলে উম্মাহর ফকীহদের সম্মুখে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যে সমস্ত অঞ্চলে সারা রাতে সান্ধ্য লালিমা অস্ত যায় না, সেখানে এশা ও ফজর নামাযের বিধান কী? একদল ফকীহের অবস্থান ছিল এই মতের উপর যে, নামায ফরয হওয়ার সম্পর্ক তার সময়ের সাথে। বিধায় যে জায়গায় বিশেষ কোন নামাযের সময় হয় না সেখানে ঐ নামাযও ফরয হবে না। সুতরাং তাদের বক্তব্য হল, এ সমস্ত অঞ্চলে যেহেতু সান্ধ্যলালিমা অস্ত যায় না তাই এশার নামায সেখানে ফরযই হয় না।

কিন্তু ফোকাহায়ে কেরামের বড় একটি দলের বক্তব্য এই যে, সান্ধ্যলালিমা অস্তমিত না হওয়ার কারণে এশার নামায বাদ পড়বে না। বরং ঐ সমস্ত অঞ্চলের লোকদেরকে সময় হিসেব করে এশা ও ফজর

১. এ বক্তব্য শামছুল আইম্মা হালুয়ানী (রহঃ) ও বাকায়ী (রহঃ)এর দিকে সম্পৃক্ত। আল্লামা শরনবুলালী (রহঃ)ও এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (রদ্দুল মুহতার, পৃঃ ৩৬২, খণ্ড-১)

নামায আদায় করতে হবে। (মুগনীউল মুহতাজ, পৃঃ ১২৩, খণ্ড ১)

শাফেয়ী মাযহাবের উলামায়ে কেরাম ও হানাফী মাযহাবের গবেষক আলেমগণও এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন আল বোরহানুল কাবীর, মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম, আল্লামা ইবনু আমীর আলাহাজ্জ ও আল্লামা কাসেম বিন কতলুবাগা (রহঃ) প্রমুখ। আল্লামা ইবনে হুমাম (রহঃ) ফতহুল কাদীর গ্রন্থে অত্যন্ত জোরালোভাবে একথার সমর্থন করেছেন। মালেকী মাযহাবের আলেমদের মধ্য থেকে আল্লামা কারাফী (রহঃ)ও এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

(আস সাবী আলাদ দারদির পৃঃ ২২৫, খণ্ড ১)

পরবর্তীকালের হানাফী আলেমদের মধ্যে আল্লামা হারুন বিন বাহাউদ্দীন মারজানী (রহঃ) (মৃত্যু ঃ ১৩০৬ হিজরী) নামে এক বুযুর্গ অতিবাহিত হয়েছেন। 'তাওযীহ' গ্রন্থের উপর তাঁর টিকা সুপ্রসিদ্ধ। তিনি এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তিকা রচনা করেছেন, যার নাম 'নাযুরাতুল হাক্কী ফি ফারযিয়াতিল ইশায়ি ওয়া ইল্লাম ইয়াগিবিশ শুফুক'। এই পুস্তিকার হস্তলিখিত একটি কপি 'পীর ঝাণ্ডুর' গ্রন্থাগারে রয়েছে। সেখান থেকে ফটোকপি করে এক বন্ধু আমার নিকট একটি কপি পাঠিয়েছিলেন। এই পুস্তিকায় তিনি জোরালো ভাবে ঐ সমস্ত লোকের কথাকে রদ করেছেন, যারা বলে যে, এ সমস্ত অঞ্চলে এশার নামায ফরযই হয় না। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর দৃঢ় প্রমাণমালা দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে, তাদের উপর এশার নামায ফরয। তারা সময়ের হিসাব করে এ নামায আদায় করবে। আমি আমার রচিত 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে (পৃঃ ৩৭৬-৩৭৮) এ পুস্তিকার নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করেছি এবং প্রমাণ করেছি যে, এ মতই সঠিক এবং অবশ্য পালনীয়। এর সমর্থন একটি হাদীস দ্বারাও হয়ে থাকে, যা আমি ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে তুলে ধরব।

যাই হোক, সঠিক কথা এটিই যে, এশা ও ফজর নামায ঐ সমস্ত অঞ্চলেও ফরয। তবে সেগুলো আদায় করার জন্য হিসেব করে সময় নির্ধারণ করতে হবে। হিসাব করে সময় নির্ধারণের বিভিন্ন পন্থা ফকীহগণ বর্ণনা করেছেন।

একটি পন্থা এই যে, ঐ সমস্ত অঞ্চলের নিকটবর্তী যে শহরে সান্ধ্যলালিমা অস্ত যায়, সেখানে যখন এশার ওয়াক্ত হবে, তখন এ সমস্ত অঞ্চলেও এশার নামায পড়বে। আর সেখানে যখন ফজরের সময় হবে, তখন এখানেও ফজরের নামায আদায় করবে।

দ্বিতীয় পন্থা এই যে, ঐ সমস্ত অঞ্চলে যেদিন শেষবার সান্ধ্যলালিমা অস্তমিত হয়েছে, সেদিন এশার ওয়াক্ত যেটি ছিল ঐ ওয়াক্তই এমন মৌসুমেও এশার ওয়াক্ত মনে করবে, যখন সান্ধ্যলালিমা অস্ত যায় না। একইভাবে সেদিন ফজরের যে সময় ছিল, ঐ সময়কেই ঐ মৌসুমেও ফজরের ওয়াক্ত মনে করবে।

তৃতীয় পন্থা এই যে, ঐ সমস্ত অঞ্চলে সান্ধ্যলালিমা সারারাত বিরাজ করলেও তার দিক পরিবর্তিত হতে থাকে। অর্থাৎ রাতের শুরুভাগে সান্ধ্যলালিমা অস্তাচলে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে তা উত্তরদিকে স্থানান্তরিত হতে থাকে। অবশেষে তা উদয়াচলে পৌঁছে যায়। তাই কতিপয় আলেম এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সান্ধ্যলালিমা পশ্চিমদিকে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত মনে করা হবে। আর যখন তা পূর্ব দিকে চলে যাবে তখন থেকে ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়েছে মনে করা হবে। এর সহজ পন্থা এই যে, সূর্য অস্ত যাওয়া থেকে নিয়ে পুনরায় উদিত হওয়া পর্যন্তের সময়কে দু' ভাগে ভাগ করবে। প্রথমাংশ মাগরিব ও এশার সম্মিলিত অংশ হবে। দ্বিতীয় অংশ হবে ফজরের। (নাযুরাতুল হক, পৃঃ ৮৬)

যখন থেকে মুসলমানগণ ঐ সমস্ত অঞ্চলে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেছে, তখন থেকে এই তিন পদ্ধতির যে কোন পদ্ধতির উপর আমল করা হচ্ছে। বৃটেনের কিছু এলাকায় প্রথম পন্থা আর কিছু এলাকায় তৃতীয় পন্থার উপর আমল করা হয়। ওসলোর বেশীর ভাগ মসজিদে এশার নামায মাগরিবের সোয়া ঘন্টা পর আর ফজর নামায সূর্যোদয় থেকে এক ঘন্টা বা আধাঘন্টা পূর্বে হয়ে আসছে। যেদিন আমি ওসলো পৌঁছি সেদিন আমিও ঐ তরতীব মতই নামায আদায় করি। কিন্তু এই পন্থায় এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময় এত কম হয়ে থাকে যে, এর মাঝে ঘুমানো এবং তারপর ফজরের জন্য ওঠা অনেক লোকের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এরও সুযোগ রয়েছে যে, তৃতীয় পন্থা অনুপাতে সূর্যাস্ত

ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ের অর্ধেক অতিবাহিত হলে ফজর নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়বে। ওসলোতে রাত দেড়টার দিকে সে হিসেবে ফজরের সময় হচ্ছিল। সুতরাং পরবর্তীতে এই পন্থার উপর আমল করে অনেকবারই আমরাও ফজর নামায দুইটার দিকে ঐ সময় আদায় করি, যখন সান্ধ্যলালিমার আলো উদয়াচলে প্রকাশ পেয়েছে।

ওসলোতে অবস্থান

১৮ থেকে ২১শে আগষ্ট পর্যন্ত আমরা ওসলোতেই অবস্থান করি। এ ঋতুতে এখানকার আবহাওয়া আমার নিকট খুবই মনোমুগ্ধকর ও আনন্দকর মনে হয়। বিশেষ করে রাতের বেলায়। সন্ধ্যার ন্যায় আলো-আঁধারী পরিবেশ, আকাশে বিস্তৃত শুভ্রতা ও তরতাজা বায়ুর দোলা এবং তারফলে সুউচ্চ 'চিড়' বৃক্ষের পত্ররাজির সুললিত ঝাপ্টাধ্বনি বড়ই পুলকোদ্দীপক মনে হয়। আমাদের থাকার ব্যবস্থা যে বাড়ীতে করা হয়েছিল, তা ছিল একটি টিলার উপর। তার বারান্দা থেকে সম্মুখস্থ সবুজ-শ্যামল উপত্যকাসমূহের নীচে একটি উপসাগর দৃষ্টিগোচর হত। আর তার পশ্চাতে সবুজে ঢাকা পাহাড় গোচরীভূত হত। রাতের বেলা যখন বেশীর ভাগ মানুষ ঘুমিয়ে পড়ত আর আমাকে নামাযের প্রতীক্ষায় জাগতে হত, তখন নীরব-নিঝুম-প্রশান্ত এই পরিবেশে পদচারণা অপূর্ব উপভোগের সঞ্চার করত।

ওসলোর তিনদিনের এই অবস্থানকালে আমাদের মেজবান ডঃ খালেদ সাঈদ সাহেব শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানও ঘুরে দেখান। তার মধ্য থেকে ড্রামেন (Drammen) নামে প্রসিদ্ধ জায়গাটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি ওসলো শহর থেকে প্রায় ৫০/৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছোট একটি শহর। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীর অসাধারণ সৌন্দর্যে সজ্জিত করেছেন এ শহরটিকে। শহরটি মুখোমুখী কয়েকটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। যার মধ্য দিয়ে কলকল রবে একটি নদী প্রবাহিত। কিছুদূর পরপর নদীর উপর সেতু তৈরী করে শহরের উভয় অংশকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই পাহাড়দ্বয়ের পেট বিদীর্ণ করে মাঝখান দিয়ে স্তম্ভাকৃতির একটি সুড়ঙ্গ তৈরী করা হয়েছে। যা

পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সিঁড়ির আকারে উপরে উঠে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত চলে গেছে। এই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করার পর গাড়ীকে কোন জায়গায় মোড় নিতে হয় না। বরং ষ্টিয়ারিং একটু বাঁকা করে রাখা হলে গাড়ী সুড়ঙ্গের সাথে সাথে নিজেই মোড় নিতে থাকে এবং অবশেষে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আসে। পাহাড়ের উপর পৌছার পর বেশ দীর্ঘ ও প্রশস্ত একটি সমতল ভূমি রয়েছে, যার প্রান্ত থেকে শহর, নদী, পাহাড়, পুল, ফোয়ারা ও বন–বনানীর এমন এক মনকাড়া দৃশ্য সম্মুখে আসে, যা দেখে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে—

تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

'অতি মহান সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ'।

ছোট এ শহরেও মুসলমানের বাস রয়েছে। এখানে তারা দু'টি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। ওসলোর শহরতলী এলাকা এ জাতীয় অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্যসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ। এটি পাহাড়ী এলাকা, যার উপর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত সুউচ্চ 'চিড়' বৃক্ষ ছায়াপাত করে আছে। এখানকার সবুজ–শ্যামলিমার অবস্থা এই যে, বসতিহীন অঞ্চলসমূহে এক গজ জায়গাও শুষ্ক দেখা যায় না। উপরন্তু, পাহাড়ী নদীসমূহ জলপ্রপাতের ন্যায় রূপ ধারণ করে এবং উপসাগরসমূহ পাহাড়সমূহের মাঝখানে নিজেদের জায়গা করে নিয়ে এখানকার সৌন্দর্যকে চতুর্গুণ বৃদ্ধি করেছে। ওসলোর তিনদিনের এই অবস্থানকালে ডঃ খালেদ সাঈদ সাহেবের উসিলায় আমরা প্রাকৃতিক এই অপূর্ব দৃশ্যাবলীকে খুব করে উপভোগ করি।

ট্রমসোতে

২১শে আগষ্ট বিকাল ৬টায় আমরা বিমানযোগে নরওয়ের উত্তরের শহর ট্রমসোর (Tromso) উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। প্রায় দু' ঘন্টা ওড়ার পর বিমান ট্রমসো বিমানবন্দরে অবতরণ করে। শহরটি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণেও একটি দর্শনীয় স্থান। কিন্তু আমাদের জন্য এর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এটি স্ক্যানডিনাভিয়ার এমন বড় শহরসমূহের অন্যতম, যেখানে মে থেকে আরম্ভ করে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সূর্য মোটেও অস্ত যায় না। বরং প্রায় তিন মাস পর্যন্ত শুধুই দিন থাকে। আর

শীতকালে তিন মাস পর্যন্ত সূর্য উদয় হয় না। কেবলই রাত থাকে। যে তারিখে (২১শে জুলাই) আমরা সেখানে পৌছি, সেটি ছিল শহরে সূর্য অস্ত না যাওয়ার সম্ভবত শেষ দিন। আমরা বিকাল আটটার দিকে সেখানকার বিমানবন্দরে অবতরণ করি। দিনের আলোয় তখন তৃতীয় প্রহর বলে মনে হচ্ছিল। আমরা আসর নামায সেখানে পৌছে নয়টার দিকে পড়ি। খানা খাওয়ার পর কিছু সময় বিশ্রাম করে যখন (রাত) সাড়ে এগারোটার দিকে হোটেল থেকে বের হই তখন সেখানকার পরিবেশ এমন আলোকিত ছিল, যেমন আমাদের দেশে আসরের পর হয়।

ট্রমসো শহরের পূর্ব দিকে একটি পর্বতমালা রয়েছে, আরেকটি পর্বতমালা রয়েছে তার পশ্চিমে। এতদুভয়ের মাঝে সুদীর্ঘ একটি দ্বীপ রয়েছে, যার চতুর্দিকে উপসাগরের পানি ছড়িয়ে আছে। ট্রমসো শহরের অধিকাংশ জনবসতি দীর্ঘ এই দ্বীপের মাঝে অবস্থিত। তবে কিছু বসতি পূর্ব দিকের পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। দ্বীপকে পূর্ব দিকের পাহাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য মেহরাব সদৃশ সুদৃশ্য এক সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতু পার হয়ে পূর্ব দিকের পাহাড়ের চূড়ায় পৌছলে সেখান থেকে পশ্চিমের দিগন্ত সুস্পষ্ট দেখা যায়। রাত বারোটায় মানুষ সেখানে মধ্যরাতের সূর্য (Midnight Sun) দেখতে যায়। আমরাও একই উদ্দেশ্যে পূর্বের সেই পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে পৌছি। একটি ক্যাবলকারযোগে পাহাড়ের চূড়ায় যখন পৌছি, তখন রাত বারোটা বাজছিল। এই চূড়ার প্রান্তে দাঁড়িয়ে সমগ্র ট্রমসো শহরের অপূর্ব দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। পাহাড়ের নীচেই সমুদ্র। পুলের ওপারে সুদূর বিস্তৃত শহর। তার পশ্চাতে আবার সমুদ্র–জল। তারপর পশ্চিমের পাহাড়সারি। পাহাড়–সারির উপর রাত বারোটায়ও সূর্য আলো বিকিরণ করছিল। সেদিন পশ্চিম দিগন্ত কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল বিধায় সূর্য দেখা যাচ্ছিল না। তবে তার থেকে উৎসরিত কিরণমালা মেঘের প্রান্তকে সোনালী বানিয়েছিল। তার আলোতে পুরো পরিবেশ তেমনই আলোকিত ছিল, যেমন আলোকিত থাকে সূর্যোদয়ের পর ভোরবেলা। রাত বারোটায় সূর্য পশ্চিম দিগন্তে যতটুকু নীচে এসেছিল, এটি ছিল তার সর্বনিম্ন বিন্দু। বারোটার পর সূর্য অস্ত না গিয়ে উত্তর দিকে ঘুরে পুনরায় উপরে উঠতে আরম্ভ করে।

প্রকৃত অবস্থা এই যে, ট্রমসো উত্তরে প্রায় সত্তর ডিগ্রী অক্ষাংশে অবস্থিত। এটি উত্তর মেরুর নিকটবর্তী হওয়ার ফলে এখানে সূর্যের পরিভ্রমণ তীর্যক হয়ে থাকে। সুতরাং সূর্য কখনই মাথার উপর আসে না। বরং দিগন্তের প্রান্ত ধরে এমনভাবে অতিক্রম করে যে, রাত বারোটার পর তা উত্তর দিকে গিয়ে উপরে উঠতে থাকে। উত্তর থেকে পূর্ব দিকে পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক উঁচু হয়ে যায়। কিন্তু দুপুরে পূর্ব দিকে তার সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছে দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে গিয়ে নীচে নামতে আরম্ভ করে। অবশেষে রাত বারটায় পশ্চিমে পৌঁছতে পৌঁছতে একবারে নীচে চলে আসে। কিন্তু দিগন্তের নীচে অস্তমিত না হয়ে পুনরায় উত্তর দিকে পরিভ্রমণ আরম্ভ করে। তিন মাস পর্যন্ত এখানে তার পরিভ্রমণ এভাবেই চলতে থাকে, যার ফলে এ অঞ্চল তিন মাস পর্যন্ত রাতের অন্ধকার দেখতে পায় না। রাত বারোটায় দিনের আলো খুব বেশী হলে এতটুকু নিস্তেজ হয়ে আসে, আমাদের দেশে সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে কিংবা সূর্যোদয়ের কিছু পরে যতটুকু হয়ে থাকে। বিধায় এই তিন মাস এখানে রাতদিন নির্ধারণ আলো ও অন্ধকারের ভিত্তিতে নয় বরং ঘড়ির ঘন্টার হিসেবে হয়ে থাকে। তাই যে সময়কে আমি রাতের বারোটা বলছি তার অর্থ এই নয় যে, সাধারণ নিয়মমাফিক এখন এখানে রাতের অন্ধকার বিরাজ করছে। বরং এর উদ্দেশ্য হল এখন ঘড়ির সময় অনুপাতে রাত বারোটা বেজে থাকে। যদিও দিনের আলো এ সময়েও বিদ্যমান। দূরবর্তী জিনিস এখন তেমনই দৃষ্টিগোচর হয় যেমন আমাদের দেশে মাগরিবের কিছু পূর্বে দৃষ্টিগোচর হয়।

আমরা যখন ট্রমসোর পূর্বদিকের পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছি, তখন পারিভাষিক অর্থে রাতের বারোটা বেজেছে। এ সময় সূর্য পশ্চিম দিগন্তে তার সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌঁছেছে। কিন্তু বারোটা বাজার পর তা উত্তর দিকে ঝুঁকে গিয়ে পুনরায় উপরে উঠতে আরম্ভ করে। মধ্যরাতে সূর্যের এই বিস্ময়কর কাণ্ড এবং তার বিকীর্ণ আলোতে অপরূপ এই শহরের চতুর্পার্শ্বের এই দৃশ্য এতই মনোহরী ছিল যে, এই পাহাড়ের তীরে যে পর্যবেক্ষন স্থান (View Point) নির্মিত হয়েছে সেখান থেকে সরে আসতে মন চাচ্ছিল না। কিন্তু তীব্র শীতের তুষার বায়ু অল্পকাল পর আমাদেরকে

সেখান থেকে সরে এসে তৎসংলগ্ন নির্মিত রেস্তোরাঁভ্যন্তরে উপবেশন করে কাঁচ–প্রাচীরের মধ্য দিয়ে সূর্যের এই গতিবিধি দেখতে বাধ্য করে। রেস্তোরাঁর ভিতরেও সূর্যের বিস্তৃত আলো পৌঁছুচ্ছিল। কিন্তু যেহেতু পারিভাষিক অর্থে তখন রাতের সাড়ে বারোটা বেজেছিল তাই রেস্তোঁরার মালিক লৌকিকভাবে টেবিলে টেবিলে প্রদীপ জ্বালিয়েছিল। কিন্তু তা সূর্যের আলোর সম্মুখে প্রদীপ বৈ আর কিছু ছিল না।

রাত একটার সময় আমরা সেই পাহাড় চূড়া থেকে অবতরণ করি। যখন আমরা পুনরায় হোটেলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি, তখন সূর্য উপরে উঠে গিয়েছিল। সাড়ে এগারোটার সময় আমরা এখানে আসার কালে যেমন আলো দেখেছিলাম এখন তার চে' অধিক আলো বিরাজ করছিল। এখানে আমরা ওসলোর হিসেবে নামায আদায় করছিলাম বিধায় ওসলোর হিসাব মতে ফজরের ওয়াক্ত হতে প্রায় আধা ঘন্টা সময় বাকী ছিল। আমি এই আধাঘন্টা সময়ে দ্রুত পায়ে হাঁটার অভ্যাসটি পুরো করি। আমাদের হোটেলটি সমুদ্র থেকে আসা উপসাগরের একটি তীরে অবস্থিত ছিল। তৎসংলগ্ন একটি বন্দর ছিল। সমুদ্রের তীর ধরে আমি হাঁটতে থাকি। সমুদ্রের মাঝে অদ্ভুদ ধরনের কিছু মাছ খেলা করছিল। কিছুক্ষণ পর পর সেগুলো লাফিয়ে সমুদ্রের উপরে উঠে আসছিল। আবার কয়েক মুহূর্তেই সমুদ্রের মধ্যে ডুব দিয়ে সমুদ্রের বুকে পানির সুদৃশ্য এক বৃত্ত তৈরী করছিল। সমুদ্র বুকে তাদের সুদূর বিস্তৃত উচ্ছলতার ধ্বনি এবং তাদের বানানো বৃত্তসমূহ মাছের এক প্যারেডের দৃশ্য তুলে ধরছিল। বহু বছর পূর্বে অনেকটা এমনই একটি দৃশ্য আমি উমরার এক সামুদ্রিক সফরে ভোরবেলায় আরব সাগরেও দেখেছিলাম। হাজার হাজার মাছ একই মুহূর্তে লাফিয়ে সমুদ্রের উপরে উঠে আসত এবং পরমুহূর্তেই একযোগে সমুদ্রতলে চলে যেত। তখন অভিজ্ঞ লোকেরা বলেছিল, সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের কিরণ লাভের জন্য মাছ এমনটি করে থাকে। কিন্তু এটি সামুদ্রিক এই জীবের পক্ষ থেকে ভোরবেলার এবাদতের একটি আঙ্গিক হওয়া অসম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআন বলেছে—

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

অর্থ ঃ 'এবং প্রতিটি বস্তুই তার প্রশস্তি সহকারে মহিমা ঘোষণা করে। কিন্তু তোমরা তাদের সে মহিমা ঘোষণা অনুধাবন করতে পার না।'

দু'টার দিকে আমরা ফজর নামায জামায়াতের সাথে আদায় করি। তারপর ঘুমানোর জন্য নিজ নিজ কক্ষে চলে যাই। কক্ষের জানালা সমুদ্রমুখী উন্মুক্ত ছিল। সেখান দিয়ে সূর্যের আলো কক্ষমাঝে এমনভাবে ছড়িয়েছিল, যেমন সকাল সাতটা–আটটার সময় হয়ে থাকে। প্রতি মুহূর্তে সে আলো বেড়ে চলছিল। তাই ঘুমানোর জন্য কামরার মধ্যে কৃত্রিম অন্ধকার সৃষ্টি করতে জানালা বন্ধ করে পর্দা টেনে দেই। পর্দা হালকা রঙ্গের ছিল বিধায় তারপরেও রাতের মত অন্ধকার হল না। দীর্ঘ বিশ ঘন্টা জেগে থাকার পর শরীর ক্লান্তিতে যদি অবশাদগ্রস্ত না হত তাহলে ঘুম আসা বড়ই কঠিন হত। এ মুহূর্তে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি স্মরণ হল ঃ

اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ

এ সময় বুঝতে পারলাম রাতের অন্ধকারও আল্লাহ তাআলার কত বড় নেয়ামত, আমরা নিত্যদিন যা লাভ করে থাকি। কিন্তু আমরা এ নেয়ামতের কথা বুঝতেও পারি না। শোকরও আদায় করি না। যে অঞ্চলে আমরা এখন অবস্থান করছিলাম তাতো সারা দুনিয়ার হিসাবে একটি ব্যতিক্রমধর্মী স্থান। সেখানে মানুষের বসবাসও খুব কম। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা দিন ও রাতে নিদ্রা ও জাগৃতির এমন ব্যবস্থাপনা তেরী করে দিয়েছেন যে, ঘুমানোর সময় হলেই পরিবেশের উপর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়। সমস্ত মানুষকে একই সময়ে নিদ্রার দিকে ধাবিত করা হয়। আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ) বলতেন ঃ 'সারা পৃথিবীর মানুষ কি আন্তর্জাতিক কোন কনফারেন্স ডেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, সমস্ত মানুষ রাতের বেলা ঘুমাবে? এটি কি সম্ভব ছিল না যে, এক ব্যক্তি ঘুমুতে চাচ্ছে আর অপর ব্যক্তি তখন ঘুম শেষ করে এমন কাজ করতে চাচ্ছে যার আওয়াজে পূর্বের ব্যক্তির ঘুমানো অসম্ভব হচ্ছে। তিনি কে,

যিনি এক ভূখণ্ডের সমস্ত মানুষকে একই সময়ে ঘুমানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন?

تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

'অতি মহান সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ।'

যাই হোক কামরার মধ্যে কৃত্রিম রাত সৃষ্টি করে আমরা ঘুমালাম। ফজর নামায পড়ে শুয়েছিলাম বিধায় সকাল আটটা পর্যন্ত ঘুমাতে কোন সমস্যা ছিল না। এভাবে দু'টা পর্যন্ত জাগা সত্ত্বেও ছয় ঘন্টার ঘুম পুরো হল। আমাদের মেজবান এবং এ সফরে আমাদের পথপ্রদর্শক ডঃ খালেদ সাঈদ সাহেব রসায়নে পি.এইচ.ডি,। তিনি ওসলোর এমন একটি প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতম অফিসার, যা বিভিন্ন ল্যাবরেটরীর গুণগত মান যাচাই করে থাকে। এ কাজের জন্য তাঁকে নরওয়েতেই শুধু নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশের ল্যাবরেটরীসমূহের যাচাইয়ের জন্য এবং সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানের জন্য খুব বেশী ভ্রমণ করতে হয়। একই উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিবছর কয়েকবার ট্রমসো এসে থাকেন। এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। তিনি বললেন যে, ট্রমসোতে একটি জাদুঘর রয়েছে, যা উত্তর মেরু ও তার আশেপাশের অঞ্চলসমূহের বিরল বিস্ময়কর বস্তুসমূহের জাদুঘর। এটি 'পোলার মিউজিয়াম' (Polar Museum) অর্থাৎ 'উত্তর মেরুর জাদুঘর' নামে প্রসিদ্ধ এবং একটি দর্শনীয় স্থান।

এই জাদুঘর আমাদের অবস্থান কেন্দ্র থেকে খুব বেশী দূরে ছিল না। তাই আমরা পায়ে হেঁটে জাদুঘরে যাই। আমাকে বলা হয়েছিল যে, ট্রমসোতে মুসলমান অধিবাসীও রয়েছে। আমার মনের বাসনা ছিল, এখানকার কোন মুসলমানের সঙ্গে যদি সাক্ষাত হতো! তাহলে তার থেকে এখানকার মুসলমানদের ব্যাপারে কিছু তথ্য জানতে পারতাম যে, তারা এখানে কিভাবে বসবাস করে? কোন মসজিদ আছে কিনা? অস্বাভাবিক দিনগুলোতে তারা কিভাবে নামায পড়ে? ইত্যাদি। ইচ্ছা করেছিলাম, জাদুঘর দেখার পর কোন মুসলমানের মাধ্যমে মসজিদের খবর নিব। কিন্তু জাদুঘরে যাওয়ার পথে যখন আমরা উভয়দিকে দোকানবিশিষ্ট একটি সড়কের উপর দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তখন

একটি মুদির দোকানের দরজায় ঝুলানো বোর্ডে কিছু আরবী শব্দ লিখিত বলে মনে হল। আমি ঐ বোর্ডটি দেখছিমাত্র, এমন সময় ভিতর থেকে দোকানদার 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলল। আমি সজাগ হয়ে লক্ষ্য করি—'এ ভূখণ্ডে আবার সালাম এল কোথেকে?' তখন দোকানের কাউন্টারে একটি আরব তরুণকে দণ্ডায়মান দেখতে পাই। সে আলজেরিয়ার লোক। আমরা নিঃসংকোচে দোকানে প্রবেশ করি। সে বলল, এখানে অনেক মুসলমান অধিবাসী রয়েছে। তাদের বেশীর ভাগ সোমালিয়ার আরব মুসলমান। অন্যান্য দেশের লোকও রয়েছে। সেই বলল যে, ট্রমসোতে একটি মসজিদও রয়েছে। যে সময় এখানে অবিরাম দিন বা রাত চলতে থাকে তখন ওসলোর নামাযের সময় অনুপাতে এখানে নামায পড়া হয়। সম্প্রতিকালে একটি তাবলীগ জামাতও এখানে এসে গেছে। এই মুসলমানটির সঙ্গে মিলিত হয়ে আত্মিক পুলক লাভ করি।

উত্তরমেরুর জাদুঘর

তারপর আমরা 'পোলার মিউজিয়ামে' প্রবেশ করি। মিউজিয়ামটির প্রেক্ষাপট এই যে, পঞ্চদশ ও ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দীতে উত্তর মেরুর দিকে বৈজ্ঞানিক ও ভৌগলিক গবেষণা ও পর্যটনের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত অভিযান চালানো হয়, ট্রমসো শহর ছিল এ সমস্ত অভিযানের সূচনা বিন্দু। অর্থাৎ এ সমস্ত অভিযান ট্রমসোর বন্দর কেন্দ্র হতে যাত্রা করত। এখান থেকেই এ উদ্দেশ্যে জাহাজ ক্রয় করা হত বা ভাড়া নেওয়া হত। এ লক্ষ্যে শ্রমিক ও কর্মচারীও এখান থেকেই সংগ্রহ করা হত। স্বভাবতই যখন এ সমস্ত অভিযান উত্তর মেরু ভ্রমণ করে প্রত্যাবর্তন করত তখন সর্বপ্রথম ট্রমসোর বন্দর কেন্দ্রেই এসে অবতরণ করত। তাই এ সমস্ত অভিযানের ফলাফল সর্বপ্রথম এ শহরেই এসে পৌছত। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত কাষ্টমের একটি গুদাম ঘরকে ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দ থেকে এ সমস্ত অভিযানের প্রাপ্ত ফলাফলের জাদুঘর বানানো হয়, যা এ সমস্ত অভিযানের স্মারক এবং সে সময়ের সংগৃহিত বিস্ময়কর বস্তুসমূহের সমন্বয়ে গঠিত। উত্তর মেরুর নিকটবর্তী দ্বীপ 'স্ভালবার্ড (Svalbard) পর্যন্ত পৌছার জন্য উত্তরের বরফ সাগর

অতিক্রম করতে হয়। এটি বরফের ন্যায় জমাট একটি সাগর। এর মধ্যে কিছু অতি ভয়ংকর হিংস্রপ্রাণী—যেমন তুষার ভল্লুক পাওয়া যায়, যা মানুষকে জীবিত ছাড়ে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে বুদ্ধি নামক এমন এক নেয়ামত দান করেছেন, যাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ নিজের থেকে বহুগুণ শক্তিশালী প্রাণীকে বশে আনতে পারে। সুতরাং উত্তর মেরুর দিকে প্রেরিত অভিযানসমূহের সদস্যরা তুষার ভল্লুক শিকার করার পদ্ধতিও আবিস্কার করে। এই পোলার মিউজিয়ামে এক ব্যক্তির স্মারকসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। তার নাম হেনরী রুডি (Henry Rudy)। তাকে 'তুষার ভল্লুকের সম্রাট' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তার সবচেয়ে প্রিয় কাজ ছিল তুষার ভল্লুক শিকার করা। সে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্তের মধ্যবর্তী সময়ে ৭১৩টি তুষার ভল্লুক শিকার করেছিল।

আমি এ জাতীয় মানবাভিযানের কৃতিত্ব থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করি যে, মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের সাহস ও সংকল্পকে অসাধারণ ক্ষমতা দান করেছেন। মানব–সাহস এমন একটি রাবার, যাকে মানুষ যত ইচ্ছা লম্বা করতে পারে। উত্তরমেরু ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের ভ্রমণ একটি চরম দুস্কর ব্যাপার। প্রথমতঃ সেখানকার শীত এত তীব্র যে, সমুদ্র পর্যন্ত জমাট হয়ে যায়। এর সামান্য অনুমান এ থেকে করা যেতে পারে যে, ট্রমসো ও নর্থকেইপে (আমাদের অবস্থানকালে) এই গ্রীষ্ম ঋতুতেও তাপমাত্রা হিমাংকের নিকট অবস্থান করছে। অথচ এ অঞ্চল মূল উত্তরমেরু থেকে প্রায় ত্রিশ ডিগ্রী আগে। তাহলে খোদ মেরু অঞ্চলে বা স্ভালবার্ড (Svalbard) দ্বীপে শীত কত বেশী হবে? উপরন্তু যেই তুষার ভল্লুককে বিশ্বের ভয়ংকরতম হিংস্র প্রাণীর মধ্যে গণ্য করা হয়, উষ্ণ এলাকার অধিবাসী একজন মানুষের পক্ষে তার সঙ্গে লড়া মৃত্যুর সঙ্গে লড়ারই নামান্তর। কিন্তু যখন মানুষ সংকল্প করেছে এবং এজন্য সাহসে কোমর বেঁধেছে, তখন আল্লাহ তাআলা তার সাহসকে এমন শক্তি দিয়েছেন যে, একজন মানুষ ধ্বংসাত্মক এই শীতের মধ্যে এমন এক বিরান অঞ্চলে সাত শতাধিক ভয়ংকর ভল্লুক শিকার করতে সফল হয়েছে। অথচ ভল্লুক শিকার করা এমন কোন উচ্চতর লক্ষ্য নয়, যার জন্য প্রাণকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে হবে। এর ফল তো শুধুমাত্র এতটুকু

যে, এই ব্যক্তির নাম শুধুমাত্র ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে উজ্জ্বল হয়েছে, যারা ট্রমসোর পোলার মিউজিয়ামে গিয়ে সেখানকার অবস্থা দেখেছে এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য তার সাহস ও বীরত্বকে ধন্যবাদ দিয়েছে। ব্যাস এতটুকুই। এর অধিক তার আর কোন প্রাপ্তি নেই।

এখানে শিক্ষা গ্রহণের বিষয় এই যে, মানবের এই সাহস ও সংকল্প—যার মধ্যে এত অদৃশ্য শক্তি সুপ্ত রয়েছে—তা যদি উচ্চতর কোন লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহৃত হয় তাহলে তা কত অলৌকিক ব্যাপারই না দেখাতে পারে। মানুষ বলে থাকে যে, আমাদের দ্বারা শরীয়তের ফরয ও ওয়াজিব কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, কিংবা গোনাহ থেকে বাঁচা আমাদের জন্য কঠিন। কিন্তু সেই মানবীয় সাহস, যা সীসাকে মোম বানিয়েছে, যা তুষার ও অগ্নির সঙ্গে লড়াই করেছে, যা সমুদ্র চিরে ও পাহাড় বিদীর্ণ করে ইচ্ছামত পথ তৈরী করেছে, যা বনের হিংস্র প্রাণী ও তুষার ভল্লুককে বশ করেছে সেই মানবীয় সাহস কি তার স্রষ্টা ও মনিবের আনুগত্যের উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনে এতই দুর্বল যে, তার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায, একমাসের রোযা আর কিছু মন্দ চরিত্রকে পরিহার করা অসম্ভব? তাই যখন বুযুর্গগণ বলেন যে, সাহস প্রয়োগ করে ফরয কাজগুলো সম্পাদন করো, আর পাপ কাজ থেকে বিরত থাকো, তখন তাঁরা মানুষের ঐ গোপন শক্তির দিকেই ইঙ্গিত করেন, যা দৃঢ় সংকল্প, প্রশিক্ষণ ও অবিচলতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হলে অফুরন্ত সম্ভাবনার (Potentials) দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে এবং মানুষ তার মাধ্যমে জটিল থেকে জটিলতর কাজকে সহজ করতে পারে।

এই জাদুঘরেই উত্তরের জমাট সাগরে প্রাপ্ত জলজপ্রাণীর নমুনাসমূহও কাঁচের শোকেসে সংরক্ষিত রয়েছে। তার মধ্যে বিরল ও বিস্ময়কর আকৃতির মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী, সীল ইত্যাদি রয়েছে। তুষার শৃগাল ও উত্তরাঞ্চলের ১২ শিংবিশিষ্ট হরিণ ইত্যাদির নমুনাও প্রদর্শনের জন্য এখানে সংরক্ষিত রয়েছে। সমুদ্রের বিশেষ করে উত্তর সাগরের বিভিন্ন ঋতুর পরিস্থিতিও দেখানো হয়েছে। এক জায়গায় এটিও দেখানো হয়েছে যে, কিভাবে সমুদ্রগর্ভে ঘূর্ণন সৃষ্টি হয়। তার ফল কি হয়। এক জায়গায় দেখানো হয়েছে যে, উত্তর সমুদ্রের একটি অংশ তার মূল

তাপমাত্রার দিক থেকে তো ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে যাওয়ার মত, কিন্তু সমুদ্রের উপরভাগের তল দিয়ে গরম পানির এমন একটি স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, যা আমেরিকার কোন সাগর থেকে প্রবাহিত এই অঞ্চলে আসছে। গরম পানির এই স্রোতের ফলে সমুদ্রের উপরিভাগ জমাট বাঁধা থেকে রক্ষা পায়, যার ফলে এখান দিয়ে জাহাজ চালানো সম্ভব হয়।

تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

'অতি মহান সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ।'

আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, স্ভালবার্ড (Svalbard), যা ট্রমসো থেকে ৯৩০ কিলোমিটার দূরে, প্রায় ৮১ ডিগ্রী অক্ষাংশে অবস্থিত। অর্থাৎ মূল উত্তরমেরু থেকে মাত্র নয় ডিগ্রী দূরে অবস্থিত। এ দ্বীপটি সম্পূর্ণরূপে জনবসতিশূন্য, তবে দ্বীপের দক্ষিণের যে সমস্ত অঞ্চল বাহাত্তর ডিগ্রী অক্ষাংশের নিকটবর্তী সেখানে কিছু বসতি রয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা উত্তরমেরুর অবস্থা যাচাইয়ের জন্য এখানে একটি ষ্টেশনও বানিয়েছে। সেখানে গবেষণার টিম যেয়ে থাকে। কারণ, উত্তরমেরুর নিকটবর্তীতম স্থলভাগ এটিই। প্রশাসনিক দিক থেকে এই দ্বীপ নরওয়ে সরকারের অধীনে। তবে একটি চুক্তির অধীনে নরওয়ে ও রাশিয়া উভয়ে এখানকার খনি খনন করে কয়লা উত্তোলন করে থাকে। ট্রমসোর পোলার মিউজিয়ামে এই দ্বীপটি ভ্রমণ করানোরও বড় চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে। জনৈক ব্যক্তি হেলিকপ্টারের মাধ্যমে এ দ্বীপের দৈর্ঘে-প্রস্থে ভ্রমণ করে তার দৃশ্যাবলীর একটি ভিডিও ফিল্ম তৈরী করেছে। এই জাদুঘরের একটি হলকক্ষে এ সমস্ত দৃশ্য দেখানোর জন্য একটি পেনারমিক স্ক্রীন তৈরী করা হয়েছে। এটি হলকক্ষের সম্মুখস্থ প্রাচীরকে বেষ্টন করে রেখেছে। এই ফিল্ম যখন ঐ স্ক্রীনের উপর Three Dimensional ছবিরূপে দেখানো হয়, তখন মানুষ উপলব্ধি করে যে, সে নিজেই হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ঐ দ্বীপ ভ্রমণ করছে। যেহেতু দ্বীপটি সম্পূর্ণটাই জনবসতিশূন্য, তাই সেখানে কোন মানুষের অস্তিত্ব কল্পনার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু দ্বীপের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী—পাহাড়, তুষার স্তূপ (Glaciers) জমাট সমুদ্রের উপসাগর, কোথাও কোথাও প্রবাহিত জলপ্রপাত আরো নাজানি মহান আল্লাহর শিল্পকর্মের কত বিস্ময়কর রাজকর্মসমূহ—এমনভাবে চোখের সামনে

ধরা দেয় যে, অন্তর্দৃষ্টি থাকলে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠবে—

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا

'হে প্রভু! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করোনি।'

নর্থ কেইপের সমুদ্র ভ্রমণ

জাদুঘর দেখে শেষ করতে করতে দু'টা বেজে গিয়েছিল। আমাদেরকে তিনটার পর আরো সম্মুখস্থ নর্থ ক্যাপ (North Cape) যাওয়ার জন্য সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ করতে হবে। তাই আমরা যোহর নামায ও দুপুরের আহার শেষ করে বন্দরের দিকে যাই। বন্দরটি হোটেলের খুব নিকটেই ছিল। এখান থেকে ভেস্টেরালিন (Vesteralin) নামের একটি জলজাহাজে আরোহণ করি। এটি মাঝারি ধরনের একটি ছ' তলা বিশিষ্ট জাহাজ। এর মধ্যে যাত্রীদের আরাম–আয়েশ ও সুযোগ–সুবিধার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে। বিকাল পাঁচটায় জাহাজ ট্রমসো বন্দর থেকে ক্রমশ চলতে আরম্ভ করে। অল্পক্ষণের মধ্যে ট্রমসোর উপসাগর হতে বের হয়ে বড় সমুদ্রে প্রবেশ করে। যে সাগরের মধ্য দিয়ে আমরা ভ্রমণ করছি সেটি মূলতঃ আটলান্টিক মহাসাগর থেকে উত্তর দিকে এসেছে। গোড়ার দিকে একে উত্তর সাগর (North Sea) বলা হয়। নরওয়ের সীমান্তে প্রবেশ করে এর নাম হয়েছে নরওয়ে সাগর (Norwegian Sea)। এ সাগরটিকেই উত্তরে ৬৬ ডিগ্রী অক্ষাংশে পৌঁছে তুষার অঞ্চলে (Arctic Zone) [১] প্রবেশ করলে আর্কটিক মহাসাগর (Arctic Ocean) বলা হয়।

১. ভূগোলের পরিভাষায় আর্কটিক সার্কেল (Arctic Circle) পৃথিবীর ঐ অংশকে বলে, যা উত্তরে ৬৬ ডিগ্রী ৩৩ মিনিট অক্ষাংশ থেকে ৯০ ডিগ্রী (উত্তর মেরু) পর্যন্ত বিস্তৃত। এটিই সেই অঞ্চল, যেখানে বছরের কিছু দিন এমন আসে, যখন গ্রীষ্মকালে সূর্যাস্ত হয় না আর শীতকালে সূর্যোদয় হয় না। ৬৬ ডিগ্রী ৩০ মিনিট থেকে দ্রাঘিমাংশ যত বৃদ্ধি পেতে থাকে গ্রীষ্মে দিন আর শীতে রাত ততই দীর্ঘ হতে থাকে। এমনকি ৯০ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ (উত্তরমেরু)তে পৌঁছে ছয় মাস থাকে দিন আর ছয় মাস থাকে রাত। দক্ষিণে এরই বিপরীতে ৬৬ ডিগ্রী থেকে ৯০ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ পর্যন্তর অঞ্চলকে দক্ষিণ মেরু বৃত্ত (Antarctic Circle) বলা হয়। সেখানেও রাত দিনের এই অবস্থা বিরাজ করে। তবে সেখানে কোন বসতি অঞ্চল এই বৃত্তের মধ্যে পড়ে না।

ট্রমসো যেহেতু জমাট অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত, তাই এখান থেকে উত্তরমেরু পর্যন্ত সম্পূর্ণ সাগরকে 'আর্কটিক মহাসাগরই' বলা হয়। এ অঞ্চলটি ছোট ছোট সুদৃশ্য দ্বীপে ভরা। সুতরাং কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত এই সামুদ্রিক ভ্রমণে জাহাজের ডানে–বামে সবুজ শ্যামল পাহাড় আর তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী এবং উপর থেকে পতিত জলপ্রপাত বড় হৃদয়কাড়া দৃশ্য তুলে ধরছিল। আমরা আসর নামায ওসলোর সময়মত প্রায় আটটার সময় জাহাজের ডেকের উপর আযান দিয়ে জামাআতের সাথে আদায় করি। জাহাজের ষষ্ঠতলায় সীসা ঘেরা একটি হলকক্ষ রয়েছে। তাতে যাত্রীদের বসার জন্য চেয়ার ও টেবিল বসানো আছে। আসর নামাযের পর আমরা ঐ হলকক্ষে বসে উভয়দিকের স্বচ্ছ কাঁচ ভেদ করে সমুদ্রের প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করতে থাকি। সূর্য তো অস্তই যাবে না, তাই যখন রাত সাড়ে দশটা বাজল, তখন আমরা ওসলোর সময় মত মাগরিবের নামায আদায় করি। এ সময় সূর্য বেশ উঁচুতে ছিল। তবে মেঘ ঢাকা ছিল। তার বিক্ষিপ্ত কিরণমালা মেঘের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। ডেকের উপর ছিল তীব্র শীত। তুষার বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। তাই আমরা সীসাঘেরা লাউঞ্জ থেকে এ দৃশ্য উপভোগ করতে থাকি। যখন রাত বারোটা বাজল, তখন সূর্য দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু তখন মেঘ আরো গাঢ় হয়েছিল। জাহাজ ছোট ছোট উপসাগর থেকে বের হয়ে এসে আর্কটিক মহাসাগরের খোলা অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে জাহাজ দুলছিল। তবে গাঢ় মেঘ থাকা সত্ত্বেও পুরো পরিবেশে সূর্যের এতটুকু আলো বিরাজ করছিল—আমাদের অঞ্চলে মাগরিবের একটু পূর্বে যতটুকু থাকে। নিয়মমাফিক ১২টার পর সূর্য উত্তর দিকে চলে গিয়ে আবার উপরে উঠতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ আলো বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমরা ফজর নামাযের অপেক্ষায় ছিলাম, যা আমাদেরকে ওসলোর হিসাব মতে পড়তে হবে। তাই আমরা দু'টা পর্যন্ত জেগে থাকি। এ সময়ের মধ্যে সমুদ্রবক্ষে বিস্তৃত সূর্যালোক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আকাশে মেঘ না থাকলে নিশ্চয়ই রোদ দেখা যেত।

ঠিক দু'টার সময় জাহাজ উন্মুক্ত সাগর থেকে দু'টি দ্বীপের মধ্যবর্তী

উপসাগরে প্রবেশ করে। দেখতে দেখতেই জাহাজ ছোট একটি বন্দর কেন্দ্রে নোঙর ফেলে। এটি ছোট একটি শহর। নরওয়ের ভাষায় যার নাম Oksfjord লেখা ছিল। এর সঠিক উচ্চারণ আমি করতে পারিনি। এটি জেলেদের বসতি। যা তিন দিক থেকে পাহাড় ও একদিক থেকে সমুদ্রবেষ্টিত। রাত দু'টা বাজছিল কিন্তু দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত সূর্যের আলো বিস্তৃত ছিল। জাহাজ এখানে মাত্র পনের মিনিট দাঁড়ায়। তারপর পুনরায় আর্কটিক মহাসাগরের দিকে রওয়ানা করে। আমরা ফজর নামায পড়ে আমাদের কেবিনে চলে আসি। কেবিনের জানালা দিয়ে সমুদ্র ও তার পশ্চাতের সবুজ পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। দিনের আলো জানালা দিয়ে কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করছিল। কিন্তু ঘুমাতে হবে বিধায় জানালায় যতদূর সম্ভব পর্দা দিয়ে কৃত্রিম অন্ধকার সৃষ্টির চেষ্টা করি। সারাদিনের ক্লান্তির কারণে তাড়াতাড়িই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ি।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন প্রায় সাতটা বেজে গেছে। জাহাজ উন্মুক্ত সাগরবক্ষে ঘন্টাপ্রতি ১৮ সামুদ্রিক মাইল গতিতে ধেয়ে চলছিল। আরো তিন ঘন্টা পরিমাণ সফর করার পর দিগন্তে আমাদের গন্তব্য দেখা যেতে থাকে। এটি ছিল উত্তরে পৃথিবীর শেষ আবাদ শহর হোনিন্সভোগ (Honninsvog)।

হোনিন্সভোগে 'মূল ছায়া'

দিনের এগারোটার কাছাকাছি আমরা ঐ শহরের বন্দরে যখন অবতরণ করি, তখন আকাশ একেবারে পরিস্কার ছিল। চতুর্দিকে খুব রোদ ছড়িয়েছিল। আমরা গত দু'দিন ধরে দিনের আলোতেই রয়েছি। রাতের অন্ধকার দেখেছি প্রায় বাহাত্তর ঘন্টা হয়ে চলছে। এ পুরো সময়টিতে আকাশ বেশীর ভাগ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু হোনিন্সভোগে যেহেতু ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে ছিল তাই এখানে পরিস্কার দেখা যাচ্ছিল যে, সূর্য মধ্যাহ্ন রেখা দিয়ে অতিক্রমকালে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দেহের দৈর্ঘ্যের চেয়ে অধিক হয়। আমাদের স্বাভাবিক অঞ্চলসমূহে সূর্য যখন মধ্যাহ্ন রেখায় পৌছে, তখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া খুব ছোট হয়ে যায়। এই ছায়াকে ফকীহদের পরিভাষায় 'ছায়ায়ে আসলি' বা 'মূল ছায়া' বলে। যে

ভূখণ্ডে দ্রাঘিমাংশ যত কম হবে তার মূল ছায়া তত ছোট হবে। এমনকি যে সমস্ত দেশ বিষুবরেখার নীচে অর্থাৎ শূন্য দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত, সেখানে এ ছায়া মোটেও থাকে না। এ কারণেই আমাদের ফকীহগণ বলেছেন যে, আসরের সময় তখন শুরু হয়, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার থেকে দ্বিগুণ হয়ে যায়, তবে এই দ্বিগুণ হওয়া মূল ছায়ার অতিরিক্ত হতে হবে। কিছু বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন লোক ফকীহদের এই কথার উপর আপত্তি উঠিয়েছেন যে, হাদীসে ছায়া একগুণ বা দ্বিগুণ হওয়া তো উল্লেখ আছে, কিন্তু 'মূল ছায়া' বাদ যাওয়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ফকীহগণ নিজেদের পক্ষ থেকে এটি সংযোজন করেছেন। কিন্তু এখানে এসে ঐ সমস্ত ফকীহের কথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়, কারণ 'মূল ছায়া' বাদ দেওয়া না হলে ঠিক মধ্যাহ্নেই ছায়া একগুণের অধিক হয়ে যায়। কাজেই ফকীহদের একথা সাধারণ জ্ঞান (Common sense)এর কথা, যার জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। এটি ভিন্ন কথা যে, একটি হাদীসেও এর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

'হোনিন্সভোগ' ছোট একটি উপকূলীয় শহর। এরপর উত্তরমেরু পর্যন্ত অন্য কোন বসতি নেই। তাই এটি এদিকে পৃথিবীর শেষ শহর। এখানে কিছু সময় বিশ্রাম করার পর আমি কয়েক ঘন্টা সময় আমার মা'আরিফুল কুরআনের কাজে লিপ্ত থাকি। তারপর বিকাল ছয়টার দিকে আমি পদচারণার জন্য সমুদ্র তীরে বের হলে পথে কয়েকজন সোমালিয়ান মুসলমানের সাক্ষাত পেয়ে যাই। তারা বললেন যে, ছোট এই শহরেও সাত আট জন সোমালিয়ান এবং চার পাঁচজন ইরাকী মুসলমান থাকে। কোন মসজিদ তো নেই, তবে কোন ঘরে কখনও কখনও তারা জামাআতের সাথে নামায পড়ে থাকে। আমি তার কাছে এ ব্যাপারে কিছু কথা নিবেদন করলাম। আল্লাহ করুন যেন তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং পৃথিবীর এ শেষ প্রান্তেও আল্লাহর নাম স্বতন্ত্রভাবে উঁচু হতে থাকে।

সমুদ্রতীর সংলগ্ন পর্যটন কেন্দ্রিক স্মারকসমূহের একটি দোকান রয়েছে। সেই দোকানে তুষার এলাকার (Arctic Region) প্রসিদ্ধ তুষার ভল্লুকের একটি প্রকৃত কংকাল সংরক্ষিত আছে। অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি

তুষার ভল্লুক শিকার করে তার নাড়িভূড়ি বের করে চামড়াটি এভাবে সাজিয়ে রেখেছে যে, তাকে সম্পূর্ণ জীবিত ভল্লুক মনে হয়। আমি তার শ্বেতশুভ্র পশম হাত দ্বারা স্পর্শ করি। তা এতই মোলায়েম ও মসৃণ ছিল যে, তার উপর বারবার হাত ফিরাতে মন চাচ্ছিল। সুন্দর ও মোলায়েম এই পশমের নীচে রয়েছে তার মোটা চামড়া। আল্লাহ তাআলার অপার মহিমা ও নিপুণ কর্ম কুশলতার কারিশমা যে, তিনি এমন একটি ভয়ংকর হিংস্র প্রাণীকে এত সুন্দর ও এত মোলায়েম পোশাক দান করেছেন। একে দেখে আমার চিন্তা এদিকে ধাবিত হল যে, এটি গোনাহের স্বাদ ও রঙ্গের একটি বাস্তব নমুনা। তার উপরদিকে স্বাদ ও সৌন্দর্য বিরাজ করে ঠিকই কিন্তু পরিণতির দিক থেকে তা ভয়ংকর হিংস্র প্রাণীর চেয়ে কম নয়। যা মানবের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। হাঁ, তবে যদি কেউ এই হিংস্র প্রাণীকে শিকার করে তার মধ্য থেকে পাপের উপাদান বের করে ফেলে তাহলে সে এর স্বাদ ও সৌন্দর্যকে ইহকালেও উপভোগ করতে পারে।

এ দোকানেই এ অঞ্চলে সূর্যের পরিভ্রমণের দৃশ্য সম্বলিত একটি ছবিও পাই। সেই ছবিতে জনৈক ব্যক্তি রাত ৮টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত প্রত্যেক ঘন্টায় সূর্যের বিভিন্ন অবস্থানের চিত্র ধারণ করে সব কয়টি চিত্রকে একত্রিত করেছে। এই চিত্র দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, রাত ৮টার পর ১২টা পর্যন্ত সূর্য কিভাবে ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে নামতে থাকে এবং বারোটার সময় দিগন্তের একেবারে নিকটে পৌঁছে তা পুনরায় উত্তর দিকে উপরে উঠতে থাকে। অবশেষে রাত চারটায় তা উত্তরে এতটুকু উপরে উঠে যায়, আটটার সময় দক্ষিণে যতটুকু উপরে ছিল। এর সব কয়টি চিত্রকে মেলালে একটি সোনালী কণ্ঠহারের দৃশ্য দেখা যায়। এবং বোঝা যায় যে, দক্ষিণ ও উত্তরে তার উচ্চতায় কোথাও পশম বরাবর তফাৎও সৃষ্টি হয় না।

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

'অতি মহান সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ।'

সূর্য তো ডুববে না, তাই আমরা মাগরিব নামায সাড়ে দশটা বাজলে এমন অবস্থায় আদায় করি, যখন সম্মুখে উজ্জ্বল রোদ বিস্তৃত ছিল।

হোনিন্সভোগ শহর থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে সেই প্রসিদ্ধ জায়গাটি, যা নর্থ কেইপ (North Cape) নামে প্রসিদ্ধ। এটি কোন জনবসতি নয়, বরং উত্তরে পৃথিবীর স্থলভাগের শেষ প্রান্ত, যার পর উত্তর মেরু পর্যন্ত এই সমুদ্র ছাড়া অন্য কিছু নেই। যা আরো সম্মুখে গিয়ে ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে গেছে, এবং তাকে আর্কটিক মহাসাগর বলা হয়। আমরা চাচ্ছিলাম যে, পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তে আমরা মধ্যরাতে (রাত ১২টা) পৌঁছি এবং এশার নামায সেখানেই আদায় করি। সুতরাং রাত এগারোটার দিকে আমরা একটি কোচে আরোহণ করে নর্থকেইপের দিকে রওয়ানা হই। শহর থেকে বের হওয়ার পর পাহাড়, উপত্যকা ও উপসাগরের এক সুদৃশ্য ধারা আরম্ভ হয়, বিশেষ যে বিষয়টি আমি লক্ষ্য করি তা এই যে, কয়েক বছর পূর্বে আমি দক্ষিণ আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত (South Cape) পর্যন্ত গিয়েছিলাম, যাকে দক্ষিণে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত বলা উচিত। সেখানকার ভূমির উঁচু নীচু এবং সাধারণ দৃশ্যাবলীও এই উত্তর প্রান্তের সাথে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ। পার্থক্য এই যে, এখানকার পাহাড়সমূহের উপর জায়গায় জায়গায় বরফ জমাট বাঁধা দেখা যাচ্ছিল, আর শীত ছিল হিমাংকের কাছাকাছি। কিন্তু সাউথ কেইপের দ্রাঘিমাংশ যেহেতু এত অধিক নয় (তা প্রায় ৪৫ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত), তাই সেখানে শীত ও তুষারের এই দৃশ্য চোখে পড়ে না। কিন্তু উভয় স্থানের জমিনের সাধারণ দৃশ্য পরস্পরের সঙ্গে সবিশেষ সাযুজ্যপূর্ণ। মহাজগতের যেই স্রষ্টা এ পৃথিবী ও তার বিভিন্ন অঞ্চল সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এর সৃষ্টিরহস্য সম্যক অবগত। ক্ষুদ্র মানবের এ সমস্ত বিস্ময়কর সৃষ্টি দেখে অভিভূত হওয়া ছাড়া আর কী করার আছে?

নর্থকেইপ

পৌনে বারোটার দিকে আমরা নর্থকেইপে অবতরণ করি। এটি একাত্তর ডিগ্রী ১০ মিনিট ২১ সেকেণ্ডের দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত একটি উঁচুভূমির তীর। যাকে দেখলে আর্কটিক মহাসাগরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখছে বলে মনে হয়। এই প্রান্ত উত্তরে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত। এরপর উত্তরমেরু পর্যন্ত এদিকে আর কোন স্থলভাগ নেই। আমরা এখানে পৌঁছে

দেখি, সারা পৃথিবী থেকে আগত পর্যটকদের ভীড়। তারা পৃথিবীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে 'মধ্যরাতের সূর্য' দেখার জন্য এখানে সমবেত হয়েছে। শীত এত তীব্র ও তুষার বায়ু এত ধারালো যে, দেহে ধারণকৃত সমস্ত কাপড় অপ্রতুল মনে হচ্ছিল। অনুমান করা যায় যে, গ্রীষ্মঋতুতে (যখন কিনা মাসকে মাস ধরে এখানে রাত দেখা দেয়নি এবং দিগন্তে সদা সূর্য বিদ্যমান) শীতের এই অবস্থা, তাহলে শীত মৌসুমে যখন মাসকে মাস সূর্যের চেহারা দেখা যায় না তখন এখানে কী পরিমাণ শীত পড়ে? এই টিলায় দাঁড়িয়ে কিছু সময় সম্মুখস্থ সাগর ও সূর্য কিরণের দৃশ্য দেখার পর আর অধিক সময় খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হল না। তাই আমরা নিকটবর্তী নির্মিত সীসাঘেরা একটি হলরুমে প্রবেশ করি। যখন রাত সোয়া বারোটা, তখন পুনরায় বের হয়ে নর্থ কেইপের শেষ প্রান্তে বানানো একটি চত্বরের উপর চলে যাই। সূর্য তার শেষ বিন্দুতে পৌঁছে পুনরায় উঁচু হতে আরম্ভ করেছে। এ সময় দিগন্তে কিছুটা মিহিন মেঘ চলে আসে। কিন্তু সূর্যরশ্মি মেঘপ্রান্ত ভেদ করে আকাশের দিকে উঠে এসেছিল এবং পরিবেশকে আলোকিত করে রেখেছিল। সেই চত্বরে দাঁড়িয়ে আমরা উচ্চ স্বরে আযান দেই। তারপর জামাআতের সাথে এশার নামায আদায় করি।

রাত একটার সময় আমরা এখান থেকে যখন শহরের দিকে ফিরছিলাম, তখন সূর্যালোক পূর্বাধিক তীব্র হয়েছিল। পথিমধ্যে জায়গায় জায়গায় উত্তরমেরুর ১২ শিং বিশিষ্ট হরিণ (Reindeers) বিচরণ করতে দেখতে পাই। মনোমুগ্ধকর এ সমস্ত দৃশ্য উপভোগ করে রাত প্রায় দু'টায় আমরা পুনরায় অবস্থানস্থলে পৌঁছি। এটি ছিল আমাদের তৃতীয় রাত—যাতে সূর্যাস্ত হয়নি। রাত দু'টার পর ফজর নামায পড়ে ঘুমানোর জন্য আমাদেরকে কক্ষের মধ্যে কৃত্রিম অন্ধকার সৃষ্টি করতে হয়।

এ সমস্ত স্থানে নামাযের বিধান

সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এখানেই আমি এ প্রশ্নের উত্তর দেবো যে, এ ধরনের জায়গায়—যেখানে কয়েক মাস পর্যন্ত সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয় হয় না সেখানে—নামায পড়ার পদ্ধতি কী?

এ অবস্থার মূল প্রেক্ষাপট এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে এ প্রশ্ন তো কখনো দেখা দেয়নি যে, যে সমস্ত ভূখণ্ডে দিনই দিন বা রাতই রাত থাকে, সেখানে কিভাবে নামায পড়া হবে, তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপর একটি ঘটনার অধীনে এ ব্যাপারে একটি মৌলিক দিকনির্দেশনা দান করেছেন।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত নাওয়াস বিন সামাআন (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে এরশাদ করলেন ঃ সে পৃথিবীতে চল্লিশ দিন থাকবে। ঐ চল্লিশ দিনের মধ্য থেকে ১ দিন এক বছরের সমান, ১ দিন এক মাসের সমান এবং ১ দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের সাধারণ দিনসমূহের মতই হবে। এ সময় সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করলেন যে, যেদিনটি এক বছরের সমান হবে সেদিন কি আমাদের জন্য শুধুমাত্র একদিনের নামাযই যথেষ্ট হবে? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ

"لا ، اقدروا له قدره"

অর্থ ঃ 'না, এর জন্য তোমরা অনুমান করে সময় নির্ধারণ করবে।'

আমি পূর্বে লিখেছি যে, 'বোলগারের' ন্যায় অঞ্চলসমূহ, যেখানে এশার সময় হয় না, সেখানে প্রধান উক্তি বা শ্রেষ্ঠমতের ভিত্তিতে এশার নামায হিসাব করে পড়ার যে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তার ভিত্তি এ হাদীসটিই।

প্রাচীনকালের ফকীহদের যুগে মুসলমানদের বসতি এমন অঞ্চলসমূহ পর্যন্তই পৌঁছেছিল, যেখানে সান্ধ্যলালিমা অস্ত যায় না। তবে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দিনরাত উভয়টিই আসে। কিন্তু উভয়মেরুর নিকটবর্তী ঐ সমস্ত অঞ্চল, যেথানে চব্বিশ ঘন্টায় দিবস-রজনীর পরিভ্রমণ পূর্ণ হয় না, সেখানে মুসলমানদের বসতি স্থাপন সে যুগে আরম্ভ হয়েছিল না। তাই এ সমস্ত অঞ্চলের বিধান সম্পর্কে প্রাচীন কালের ফকীহগণ আলোচনা করেননি। কিন্তু যখন থেকে ঐ সমস্ত অঞ্চলেও মুসলমানগণ পৌঁছেছে, তখন থেকে সমকালীন ফকীহগণ ঐ সমস্ত অঞ্চলের বিধান

সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ঐটিই, যা 'বোলগারের' ব্যাপারে দেখা দেয়। অর্থাৎ নামাযের সময়ের প্রসিদ্ধ চিহ্ন না পাওয়ার অবস্থায় নামায ফরয হয় কি হয় না? যারা বোলগারের ন্যায় শহরে এশার নামায ফরয মানেন না তাদের বক্তব্য হল, যে সমস্ত অঞ্চলে কয়েক মাস পর্যন্ত দিন থাকে সে সমস্ত অঞ্চলে এ পুরো সময়টিতে কেবলমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ফরয হবে। কিন্তু আমি পূর্বে নিবেদন করেছি যে, দলীল প্রমাণের দিক থেকে এ উক্তিটি দুর্বল ও নিম্নমানের। দাজ্জাল বিষয়ে উপরে যে হাদীস লেখা হয়েছে, তা থেকে এ মূলনীতিটি সুস্পষ্ট বের হয়ে আসে যে, যখন দিন এত দীর্ঘ হবে যে, চব্বিশ ঘন্টায় রাতদিনের পরিভ্রমণ পূর্ণ হবে না, তখন নামাযের সময়ের প্রসিদ্ধ চিহ্ন বা নিদর্শনগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং এমন ক্ষেত্রে হিসেব করে নামায আদায় করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, এ সমস্ত অঞ্চলে নামাযের সময় হিসেব করার পন্থা কী হবে? এ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রস্তাবই পেশ করা হয়েছে, তবে এ সবের মধ্যে সর্বাধিক প্রবল, উৎকৃষ্ট ও আমলযোগ্য প্রস্তাব এই যে, ঐ সমস্ত অঞ্চলের নিকটবর্তী যে অঞ্চলে চব্বিশ ঘন্টায় দিন রাত পূর্ণ হয়, সেখানে যে নামাযের যে সময় হবে ঐ সমস্ত অঞ্চলেও ঐ সময় ঐ নামায পড়া হবে। যেমন নিকটবর্তীতম স্বাভাবিক অঞ্চলে মাগরিব নামায যদি নয়টায় হয় আর এশার নামায হয় সাড়ে দশটায় তাহলে এখানেও মাগরিব ও এশা পালাক্রমে নয়টা ও সাড়ে দশটায় পড়বে। যদিও সে সময় সূর্য দিগন্তে বিদ্যমান থাকে।

এই প্রস্তাবের উপর আমল করারও দু'টি পন্থা সম্ভব। একটি এই যে, এমন কোন নিকটবর্তী শহরকে মানদণ্ড বানাবে, যেখানে পাঁচওয়াক্ত নামাযের সময়ই তার পরিচিত আলামত সহকারে এসে থাকে। সুতরাং 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী'র একটি সিদ্ধান্তে এই প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, যে সমস্ত অঞ্চল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশের উপর অবস্থিত, তাদেরকে মানদণ্ড ধরে অস্বাভাবিক অঞ্চলসমূহে সমস্ত নামাযের সময় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীর সময় অনুপাতে নির্ধারণ করা হবে।

দ্বিতীয় পন্থা এই যে, এমন কোন শহরকে মানদণ্ড নির্ধারণ করবে, যা অস্বাভাবিক অঞ্চলসমূহের নিকটবর্তী এবং সেখানে বেশীর ভাগ নামাযের

সময় পাওয়া যায়, যদিও সেখানে সান্ধ্যলালিমা অস্ত না যাক না কেন। এ পন্থা অনুপাতে ট্রমসো প্রভৃতিতে যখন শুধু দিনই দিন থাকে, তখন ওসলোর নামাযের সময় অনুপাতে নামায পড়া যেতে পারে।

এই দুই পন্থার মধ্য থেকে প্রথম পন্থাটি অধিকতর সতর্কতামূলক, তবে দ্বিতীয় পন্থামত আমল করা অধিকতর সহজ। বিশেষ করে এমন শহরসমূহে যেখানে মুসলমানদের বাস অতি সামান্য এবং তাদের জন্য পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশের সময় সম্পর্কে অবহিত হওয়া সহজ নয়। কাজেই ট্রমসো ও তার থেকে আরো সম্মুখোস্ত শহরসমূহে ওসলোর নামাযের সময়ের অনুসরণ করলে তা জায়েয ও সঠিক হবে। হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের হাদীসে এ মূলনীতি তো বলে দিয়েছেন যে, অনুমানের ভিত্তিতে নামায পড়বে। কিন্তু সে অনুমানের পন্থা কি হবে তা তিনি বর্ণনা করেননি। সম্ভবতঃ এতে এই হিকমত তথা রহস্য নিহিত রয়েছে যে, এতে করে অনুমান করার পদ্ধতি বিভিন্ন হতে পারবে। যে জায়গায় যে পদ্ধতি অধিকতর আমলের যোগ্য এবং যে পদ্ধতি মানলে সংকীর্ণতা হবে না, সেখানে সে পদ্ধতি অবলম্বন করবে।

ট্রমসোতে যে মুসলমানের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, সেও এ কথাই বলেছে যে, এখানকার মসজিদে ওসলোর সময় হিসেবে নামায পড়ার প্রচলন রয়েছে।

ট্রমসো ও নর্থকেইপে সূর্যের পরিভ্রমণ দেখার পর আমার একটি বিষয়ের অনুমান অনেকটা নিশ্চিতের কাছাকাছি পৌছেছে। আর তা এই যে, যারা একথা বলেন যে, যে সমস্ত অঞ্চলে কয়েক মাস পর্যন্ত সূর্যাস্ত হয় না, সেখানে এই কয়েক মাসে সর্বমোট পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ফরয। তাদের এ কথার ভিত্তি ঐ সমস্ত অঞ্চল তারা প্রত্যক্ষ না করার কারণে তারা বুঝেছেন যে, ঐ কয়েক মাসে মাগরিবের মত যোহরের সময়ও কেবলমাত্র একবার এবং আসরের সময়ও মাত্র একবার এসে থাকে। অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, এখানে সূর্য মধ্যাহ্ন রেখার উপর দিয়ে প্রতিদিনই অতিক্রম করে থাকে, তাই প্রত্যেক চব্বিশ ঘন্টায় সূর্যের ছায়া (মূল ছায়া বাদে) এক গুণ বা দুই গুণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক চব্বিশ

ঘন্টায় একবার করে যোহর ও আসরের সময় অবশ্যই এসে থাকে। তাই একথা বলা ঠিক নয় যে, তিন মাস সময়ে যোহর ও আসরের সময় মাত্র একবার এসে থাকে। তাই যারা নামায ফরয হওয়ার জন্য ওয়াক্তের চিহ্নকে মূল কারণ বলে স্বীকার করে, তাদের কথামতই প্রতিদিন যোহর ও আসরের নামায ফরয হয়ে থাকে। তাই একথা বলা কোনভাবেই সঠিক নয় যে, এই তিন মাস সময় পুরোটা একদিনের হুকুম রাখে এবং এই তিন মাসে মাত্র এক ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। কারণ, যখন প্রত্যেক চব্বিশ ঘন্টায় একবার করে যোহর ও আসর নামাযের ওয়াক্ত আসে আর এ সমস্ত নামায তার ওয়াক্ত এলে ফরয হয় তাহলে বোঝা যায় যে, চব্বিশ ঘন্টায় তাদের ১ দিন পূর্ণ হয়। বিধায় পূর্ণ তিন মাসকে ১দিন সাব্যস্ত করা সঠিক নয়।

তবে হ্যাঁ, উত্তরমেরু অর্থাৎ ঠিক নব্বই দ্রাঘিমাংশে বাহ্যতঃ সূর্যের পরিভ্রমণ সম্পূর্ণরূপে যাঁতার ন্যায় হয়ে থাকে। তাই সেখানে সবকিছুর ছায়া চব্বিশ ঘন্টায় একই রকম হবে। ফলে ঠিক ঐ জায়গা সম্পর্কে এ কথা বলা যেতে পারে যে, ছায়া দ্বারা সেখানে যোহর ও আসরের সময় নির্ধারণ করা কঠিন। যদিও কতিপয় আলেমের মত এই যে, সেখানেও সূর্য যখন মধ্যাহ্নরেখা অতিক্রম করবে তখন তাকে যোহরের সময় মনে করতে হবে। (আহসানুল ফাতাওয়া, পৃঃ ১২৬, খণ্ড–২)

যাই হোক, ঠিক নব্বই অক্ষাংশে কোন মানুষ পৌছে নামায পড়ার বিষয়টি এখনও পর্যন্ত একটি কাল্পনিক ধারণা মাত্র। তবে আর্কটিক অঞ্চল (Arctic Zone)এর বেশীর ভাগ এলাকা এমন, যার মধ্যে যোহর ও আসর উভয় নামাযের আলামত সন্দেহাতীতভাবে পাওয়া যায়। তাই সূর্য অস্ত না গেলেও চব্বিশ ঘন্টায় তাদের একদিন পূর্ণ হয়। কাজেই ৩ মাস পর্যন্ত সেখানে সূর্য অস্ত না গেলে তার অর্থ এই নয় যে, এই তিন মাস এক দিন। বরং বাস্তবে এটি তিন মাসই। যার মধ্যে প্রতিদিন যোহর ও আসরের সময় এসে থাকে। তাই অবশিষ্ট নামাযসমূহও চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই আদায় করা জরুরী হবে এবং পূর্ণ তিন মাসে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার ধারণাটি এ সমস্ত স্থানের জন্য সুস্পষ্টরূপে ভ্রান্ত।

সারকথা এই যে, এ সমস্ত স্থানেও চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায

পড়াই জরুরী। তবে মাগরিব, এশা ও ফজরের সময় নির্ধারণে এই আর্কটিক অঞ্চলের (Arctic Zone) মানুষ—যারা ৬৬.৩০ দ্রাঘিমাংশের উপরে বসবাস করে—অস্বাভাবিক দিনসমূহে ওসলোর সময়কেও মানদণ্ড বানাতে পারে কিংবা পঁয়তাল্লিশ দ্রাঘিমাংশের কোন শহরকেও বানাতে পারে। ওসলোতে এশার সময়ের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি।

এখন আমি পুনরায় ভ্রমণ বৃত্তান্তে ফিরে যাচ্ছি।

ওসলোতে প্রত্যাবর্তন

২৪শে আগস্টের সকালে আমাদেরকে হোনিন্সভোগ থেকে বিমানযোগে ট্রমসো এবং সেখান থেকে ওসলো প্রত্যাবর্তন করতে হয়। হোনিন্সভোগ থেকে যে বিমানটি আমরা পাই, সেটি প্রথমে হেমারফেষ্ট (Hammerfest) নামক একটি শহরে অবতরণ করে তারপর আমাদেরকে ট্রমসো নিয়ে যায়। বিমানটি ট্রমসোতে অবতরণ করতে যাচ্ছে এমন সময় আমি লক্ষ্য করি যে, আমার মোবাইল ফোনটি—যা আমি সিটের উপর রেখেছিলাম—নেই। আমার এই ফোনটি শুধু একটি মোবাইল ফোনই নয়, বরং এটি আমার ডায়রীও। যার মধ্যে আমার সারা পৃথিবীর সম্পৃক্ত জনদের ঠিকানা, ফোন নাম্বার এবং আমার সারা বছরের প্রোগ্রামও রয়েছে। বিধায় এটি আমার জন্য একটি অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয় বস্তু। সম্ভাব্য সকল জায়গায় খোঁজার পরও না পেয়ে বিমানের কর্মচারীদেরকে জিজ্ঞাসা করি। তারা বলল যে, একটি মোবাইল ফোন আমরা এমন একটি সিটে পেয়েছিলাম, যার যাত্রী হেমারফেষ্টে অবতরণ করেছে। তাই আমরা মনে করেছিলাম যে, এই ফোন সেই যাত্রীর হবে। সুতরাং আমরা ঐ ফোনটি আমাদের হেমারফেষ্টের কর্মচারীদের হাতে অর্পণ করি। এবার অনুমিত হয় যে, কোন শিশু ঐ ফোনটি আমার সিট থেকে তুলে সেই সিটে নিয়ে যায়। আর এভাবে বিমানের কর্মচারী সেটি হেমারফেষ্টে রেখে আসে। তবে বিমানের কর্মচারীটি আমাকে নিশ্চিন্ত করে যে, সেটি অতি দ্রুত ওসলো পৌছানোর ব্যবস্থা করা হবে। তারপর যখন তাকে জানালাম যে, আমাকে ওসলো

রওয়ানা হওয়ার পূর্বে প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় ট্রমসো বিমান বন্দরে অবস্থান করতে হবে তখন সে বলল যে, আপনাদেরকে ট্রমসো নামানোর পর এই বিমান পুনরায় হেমারফেস্টে গিয়ে ট্রমসো ফিরে আসবে। ট্রমসো থেকে আপনাদের যাত্রার পূর্বেই ফোনটি আপনার নিকট পৌছে দেওয়ার আমরা চেষ্টা করব।

আমরা ট্রমসো বিমানবন্দরে নেমে পড়লাম। সেখানে ওসলোর বিমানে আরোহণ করার জন্য আমাদেরকে প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় অপেক্ষা করতে হয়। ইতোমধ্যে যোহরের সময় হয়ে যায়। আমরা যোহরের নামায আদায় করি। আমরা বিমানের সময় তালিকা দেখে জানতে পারলাম, আমাদেরকে যেই বিমানে যেতে হবে তার যাত্রার সময় ৩টা ৪০মিনিটে। আর হেমারফেস্ট থেকে আগমনকারী বিমানটি সাড়ে তিনটায় এসে পৌছাবে। যার অর্থ হল মাঝে কেবলমাত্র দশ মিনিট সময় থাকবে। তাই হেমারফেস্ট থেকে আগমনকারী বিমানটি আমার মোবাইল ফোন নিয়ে এলেও সেটি এমন সময় ভূমিতে অবতরণ করবে যখন আমরা বিমানে উঠে যাব। তাই ফোনটি আমাদের পর্যন্ত পৌছানোর জন্য এ সময় হবে অপ্রতুল। তারপরও যখন আমি আমার বিমানে আরোহণের জন্য বিমানের গেটে পৌছি এবং গেটে আমার বোর্ডিং কার্ড দেখাই তখন কাউন্টারে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি কম্পিউটার দেখে বলল যে, আপনার জন্য একটি প্যাকেট হেমারফেস্ট থেকে রওয়ানা হয়েছে যেটি বিমান রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ট্রমসো পৌছবে বলে আশা রয়েছে। কিন্তু আমরা এর প্রতীক্ষায় বিমান বিলম্ব করাতে পারব না বিধায় ইতোমধ্যে তা পৌছে গেলে তো ভাল অন্যথা আমরা সেটি আপনাকে ওসলোতে পৌছিয়ে দেব। অবশেষে আমি বিমানে এসে বসি। জানালা দিয়ে প্রত্যেক অবতরণকারী বিমানকে দেখতে থাকি। অল্পক্ষণের মধ্যে আমাদের সম্মুখ দিয়ে ঐ বিমানটি ভূমিতে অবতরণ করল, যেটিতে করে আমরা ট্রমসো এসেছিলাম। তখন আমাদের বিমান রওয়ানা হতে দশ মিনিট সময় বাকী ছিল, কিন্তু বিমানটি অবতরণ করার পর রানওয়ে অতিক্রম করে যথাস্থানে পৌছতে চার/পাঁচ মিনিট সময় লেগে যায়। আমি দেখলাম যে, যেই মাত্র বিমান তার জায়গায় পৌছে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাতে সিঁড়ি

লাগানো হল, অমনি নীলরঙের উর্দি পরিহিত এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম বিমান থেকে বের হল এবং দ্রুত সিঁড়ি অতিক্রম করে বিমানবন্দরের ভবনের দিকে দৌড়ালো। তার হাতে একটি বস্তু দূর থেকেও দেখা যাচ্ছিল। আমার প্রবল ধারণা ছিল যে, এ লোকটি আমার মোবাইল নিয়ে এসেছে। কিন্তু যে জায়গায় সে অবতরণ করেছিল তা আমাদের বিমানের জায়গা থেকে ছিল বেশ দূরে। লোকটি বিমানবন্দরের ভবনে প্রবেশ করলে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। এমনকি আমাদের বিমানের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। যাত্রার সময় হয়ে যাওয়ার ফলে বিমান পিলপিল করে চলতে আরম্ভ করে। তখন আমার আক্ষেপ হল যে, মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য ফোনটি আমার নিকট পৌছাতে পারলো না। ওসলো বিমানবন্দর শহর থেকে ষাট সত্তর কিলোমিটার দূরে। তাই ওসলো বিমানবন্দর থেকে তা সংগ্রহ করা পৃথক এক ঝামেলা হয়ে পড়বে। যার জন্য কয়েক ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হবে। কিন্তু আমি এজন্য আফসোস করছি মাত্র ইতোমধ্যে একজন এয়ারহোস্টেস এল। সে আমার সিটের নিকট এসে একটি প্যাকেট আমাকে দিল এবং বলল যে, এ প্যাকেটটি হেমারফেস্ট থেকে আপনার জন্য এসেছে। আমি পুলক ও বিস্ময় মিশ্রিত কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিমানের দরজাতো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এটি আপনার নিকট কি করে পৌছলো? এয়ারহোস্টেস উত্তর দিল, প্যাকেট বহনকারী ব্যক্তি দ্রুত নিয়ে এসে বাহির থেকে তা বিমানের ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দেয়। প্যাকেট খুলে দেখি আমার ফোনটি অক্ষত অবস্থায় আমার হাতে এসে পৌছেছে।

সত্যিই যে দায়িত্ববোধ, ক্ষিপ্রতা ও সহমর্মিতা নিয়ে এয়ারলাইন্সের লোকেরা ফোনটি আমার নিকট পৌছানোর প্রতি যত্ন নিয়েছে, এর জন্য আমার অন্তরে তাদের প্রতি বড় শ্রদ্ধা জাগল। উল্লেখ্য যে, হেমারফেস্ট থেকে বহনকারী আর আমাদেরকে নিয়ে ওসলো গমনকারী এয়ারলাইন্স দ্বয় ছিল পৃথক দু'টি কোম্পানীর। তাছাড়া ফোনটি আমার নিকট পৌছানোর আইনানুগ দায়িত্ব তাদের ছিল না। কারণ, এটি বুক করা সামানার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, এতদসত্ত্বেও এত গুরুত্ব ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে আমানতকে তার প্রাপকের নিকট পৌছানো নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়

ব্যাপার।

যাই হোক, বিকাল ছয়টার দিকে আমরা পুনরায় ওসলো পৌঁছাই। রাতের খাবারের ব্যবস্থা ছিল আমাদের বন্ধু সিদ্দীকী সাহেবের বাড়ীতে। ইনি ওসলোর সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। ওসলোতে তিনি হালাল গোশত ও অন্যান্য পণ্যের ব্যবসা করেন। এখানে তিনি একটি পাকিস্তানী রেস্তোরাঁও খুলেছেন। যেই মহল্লায় তাঁর বাড়ী ও দোকান সেটিকে পাকিস্তানী অধিবাসীদের আধিক্যের কারণে পাকিস্তানেরই একটি অংশ বলে মনে হয়। এমনকি দোকানে লাগানো বোর্ডও উর্দূতে লেখা। আজ ওসলোতে সূর্যাস্তের সময় ছিল দশটা। নব্বই ঘন্টা (প্রায় সাড়ে তিন দিন) সূর্যাস্তহীন অতিবাহিত করার পর—এখানে সূর্যাস্তের দৃশ্য অবলোকন করি।

সুইডেন

পরদিন বিকাল তিনটায় আমরা ট্রেনযোগে সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহোমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। এটি ছিল ছয় ঘন্টার পথ। ট্রেন অত্যন্ত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক ছিল। প্রায় এক ঘন্টা নরওয়ের ভিতর দিয়ে পথ চলার পর ট্রেনটি সুইডেনের সীমানায় প্রবেশ করে। তারপর সুইডেনের ভিতর দিয়ে বেশীর ভাগ পথ অতিক্রম করে। এ সম্পূর্ণ পথটি সবুজ-শ্যামল উপত্যকা, পাহাড়সারি, ঝিল ও নদীর অপূর্ব দৃশ্য দ্বারা অত্যন্ত সুসজ্জিত ছিল। রাত সাড়ে নয়টায় ট্রেন ষ্টকহোমে পৌঁছে। ষ্টেশনে আমার বন্ধু চৌধুরী মুহাম্মাদ আখলাক সাহেব স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি ষ্টকহোমের একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। সুইডেন ও নরওয়েতে তার ক্রিষ্টালের অনেকগুলো দোকান রয়েছে। তাছাড়া তিনি এখানকার একটি সুদৃশ্য মসজিদ-কমিটির সভাপতিও বটেন। মুসলমানদের ধর্মীয় তৎপরতায় তিনি খুব বেশী অংশগ্রহণ করে থাকেন।

রেলওয়ে ষ্টেশন ষ্টকহোমের প্রধান এলাকার মধ্যভাগে অবস্থিত। এর নিকটেই হোটেল শেরাটন। সেখানে আমি অবস্থান করি। এখানে দশটা বাজার কয়েক মিনিট পূর্বে সূর্যাস্ত হচ্ছিল। সুতরাং হোটেলে পৌঁছে আমরা মাগরিবের নামায আদায় করি। আখলাক সাহেব আমাকে একটি

লেবাননী রেস্তোরাঁয় নিয়ে যান। সেখানে হালাল গোশতের ব্যবস্থা ছিল। রাতের খাবারে লেবাননী আঙ্গিকের ভুনা গোশত ছিল বড় সুস্বাদু।

পরদিন ষ্টকহোমে বিশেষ কোন ব্যস্ততা ছিল না। দিনের প্রথম অর্ধেকে আখলাক সাহেব শহরটি ঘুরে দেখান। এটি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সর্ববৃহৎ ও জাঁকজমকপূর্ণ শহর। নগরায়নিক সৌন্দর্যের দিক থেকেও এটি উত্তরের সমস্ত দেশের উপর প্রাধান্য রাখে। একে উত্তর ইউরোপের 'ভেনিস' বলা হয়। সুইডেনের আয়তন ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৩২ বর্গমাইল। যা উত্তরে ৫৫ থেকে নিয়ে ৭০ দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে তার অধিবাসী ৯ মিলিয়ন (৯০ লাখ)এর অধিক নয়। যদিও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে এ এলাকা নরওয়ের সমকক্ষ নয় তবুও ৯০ হাজার ঝিলের (ব্রিটানিকা মাইক্রোপেডিয়া পৃঃ ৪-৩৬, খণ্ড ১১) সমন্বিত এ দেশটিও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে দুনিয়ার সুন্দরতম দেশসমূহের মধ্যে গণ্য হয়। রাজনৈতিক দিক থেকে একে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার এক নম্বর দেশ মনে করা হয়। কারণ, দীর্ঘদিন পর্যন্ত নরওয়ের উপরও এরই রাজত্ব ছিল।

হোটেল শেরাটন—যেখানে আমরা অবস্থান করছিলাম—মধ্য শহরে একটি উপসাগরের সম্মুখে অবস্থিত। তার ডান দিকে ষ্টকহোমের সিটি হলের গগনচুম্বী টাওয়ার। একে নোবেল টাওয়ারও বলা হয়। এর কারণ এই যে, বিশ্বের প্রসিদ্ধ 'নোবেল পুরস্কার' এ জায়গাতেই দেওয়া হয়। আলফ্রেড বার্নাড নোবেল (Alfred Bernard Nobel) মূলতঃ ষ্টকহোমের বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ডিনামাইট আবিস্কার করেন। কেমিষ্ট্রি ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে তিনি উৎকর্ষতা লাভ করেন। এর মাধ্যমে তিনি অনেক সম্পদ উপার্জন করেন। পরিশেষে তিনি তার মৃত্যুর পূর্বে (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে) এ সম্পদ দ্বারা একটি ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠা করে অছিয়ত করেছিলেন যে, প্রতিবছর এমন কোন ব্যক্তিকে এই ট্রাষ্টের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেওয়া হবে, যিনি বিজ্ঞান, সাহিত্য বা অর্থনীতিতে কিংবা নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কাজে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করেছেন। সুতরাং প্রতিবছর 'নোবেল প্রাইজ' নামে ছয়টি পুরস্কার ছয়জন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়ে থাকে। যার সিদ্ধান্ত তিনটি সুইডেনের

প্রতিষ্ঠান এবং একটি নরওয়ের প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে করে থাকে। এ সমস্ত পুরস্কার ডিসেম্বরের দশ তারিখে (যা নোবেলের মৃত্যুর তারিখ) ষ্টকহোমের এই সিটি হলে দেওয়া হয়। আর এর নামেই এই টাওয়ারটিকে 'নোবেল টাওয়ার' বলা হয়। মানুষ সিঁড়ির মাধ্যমে তার উপর আরোহণ করে শহরের দৃশ্য অবলোকন করে থাকে।

ষ্টকহোমের সর্ববৃহৎ মসজিদটিও আমাদের হোটেলের নিকটে অবস্থিত। এটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ, সুদৃশ্য ও বিশাল একটি মসজিদ। সুইডেনে এ সময় মুসলমান অধিবাসীদের সংখ্যা আনুমানিক ৪ লাখের কাছাকাছি। এখানকার আরব মুসলমানগণ 'আর রাবিতাতুল ইসলামিয়্যাহ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারই প্রচেষ্টায় গম্বুজ ও মিনার বিশিষ্ট এই বিশাল মসজিদটি নির্মিত হয়। মধ্য শহরে নির্মিত এমন বিস্তৃত ও প্রশস্ত মসজিদ অনেক ইসলামী দেশেও কমই দেখতে পাওয়া যায়। এতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অযুখানার ব্যবস্থাপনাও ঈর্ষণীয় পর্যায়ের দর্শনীয়। মসজিদ সংলগ্ন একটি ইসলামী সেন্টারও রয়েছে। সেখানে প্রতিদিন ধর্মীয় তথ্য যোগান দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে। মুসলমানদেরকে ধর্মীয় পথ প্রদর্শনের বিভিন্ন কাজও এখান থেকে করা হয়ে থাকে।

চৌধুরী আখলাক সাহেব বললেন যে, ষ্টকহোমে ছোটবড় প্রায় পঁয়তাল্লিশটি মসজিদ রয়েছে।

এটি ছিল বৃহস্পতিবার দিন। দিনের দ্বিতীয় অর্ধাংশ আমি হোটেলেই কাটাই। তখন আমার সঙ্গে আনা মাআরিফুল কুরআনের কাজ করতে থাকি।

পরদিন ছিল শুক্রবার। আমাকে জুমুআর বয়ান সেই মসজিদে প্রদান করতে হবে, যেটি পাকিস্তানী মুসলমানগণ নির্মাণ করেছেন। গত বছর আমি যখন এখানে এসেছিলাম, তখন এর নির্মাণ কাজ চলছিল। এখন মাশাআল্লাহ এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। চৌধুরী আখলাক সাহেব এ মসজিদেরই সভাপতি। এখানে জুমুআর পূর্বে আমার বয়ান হয়। জুমুআর নামাযের পর ষ্টকহোমের অনেক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। সুইডেনে নিয়োজিত পাকিস্তানের দূত জনাব শাহেদ কামাল সাহেব—যিনি এই অল্প কয়েকমাস পূর্বে এখানে দূত হয়ে এসেছেন—জুমুআতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ও দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গেও সাক্ষাত হয়।

ফিনল্যাণ্ড ভ্রমণ

ঐ দিনই বিকেল পাঁচটায় আমাদের জলজাহাজে ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিংকি যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। সুতরাং জুমুআর নামাযের কিছুক্ষণ পর আখলাক সাহেব আমাদেরকে ষ্টকহোমের বন্দর এলাকায় নিয়ে যান। এখানে বিভিন্ন জাহাজ পরিচালনাকারী কোম্পানী পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ গদি বানিয়েছে। আমাদেরকে যে জাহাজে সফর করতে হবে তার নাম ছিল সিলিজালাইন (Silijaline)। সুতরাং আমরা তার টার্মিনালে চলে যাই। এই টার্মিনাল বিমানবন্দরের টার্মিনালের ন্যায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুশৃংখল ছিল। এ জাহাজটি ঐ জাহাজের তুলনায় অনেক বড় ছিল, যাতে করে আমরা নর্থকেইপে সফর করেছিলাম। এটি ছিল ১৩ তলা বিশিষ্ট একটি জাহাজ। জেটির তৈরী পুলের মাধ্যমে জাহাজে প্রবেশ করে দেখি এটি জাহাজের সপ্তম তলা। জাহাজের তলা তো নয়, এ যেন এক জাঁকজমকপূর্ণ বাজার। এর মধ্যে দুধারী দোকান ও রেস্তোরাঁ বানানো রয়েছে। যাত্রীদেরকে একতলা থেকে অন্যতলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য জায়গায় জায়গায় ক্যাপসুল লিফট রয়েছে। মোটকথা, পুরো জাহাজটি ছোট একটি সুশৃংখল শহর ছিল, যার মধ্যে সব ধরনের শহুরে সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ছিল।

জাহাজ পাঁচটার সময় ষ্টকহোম থেকে রওয়ানা হয়ে বাল্টিক সাগরে চলতে আরম্ভ করে। এই ভ্রমণটিও তার দৃশ্যাবলীর দিক থেকে অত্যন্ত উপভোগ্য ছিল। দশটার সময় সূর্যাস্ত হলে সমুদ্র থেকে সান্ধ্যলালিমা ও সাদা আলোকের সীমারেখা খুব বেশী পরিস্কারভাবে দেখা সম্ভব হচ্ছিল। সুতরাং আমি জাহাজের ডেকের উপর থেকে রাত আড়াইটা পর্যন্ত দিগন্তে সান্ধ্যলালিমার ভ্রমণ দেখতে থাকি। এ বিষয়টি পরিস্কার দেখতে পাই যে, সান্ধ্যলালিমা প্রথমে দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে ছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে তা উত্তর দিকে বাড়তে থাকে। অবশেষে তা পূর্ব দিকে ঝুঁকে পড়ে। সান্ধ্যলালিমার এ ভ্রমণের মাঝে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদিত হয়।

তাই এর দ্বারা তাদের কথার সমর্থন হয়, যারা বলেন যে, যে সমস্ত জায়গায় সান্ধ্যলালিমা অস্ত যায় না, সেখানে যখন সান্ধ্যলালিমা পূর্ব দিকে ঝুঁকে পড়বে, তখন ফজরের সময় শুরু হবে।

সকালে আমরা ঘুম থেকে যখন জাগি, তখন জাহাজ ফিনল্যাণ্ডের সীমানায় প্রবেশ করেছে। তারপর যখন আমাদের ঘড়িতে ৯টা এবং ফিনল্যাণ্ডের সময় মত দশটা বাজছিল তখন আমাদের জাহাজ হেলসিংকির বন্দরে নোঙর ফেলে। মুহতারাম নাসিম সাহেব—যিনি বহু বছর ধরে হেলসিংকিতে বসবাস করছেন—এখানকার প্রভাবশালী পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী। তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জাহাজ পরিচালনা কোম্পানীর পক্ষ থেকেই এখানকার হোটেল রামাদায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। হোটেলটি ছিল শহরের ঠিক মাঝখানে। ফিনল্যাণ্ড উত্তর ইউরোপের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। এখন তো মোবাইল ফোনের নকিয়া কোম্পানীর কারণে এ দেশের এই উৎপন্ন পণ্যটি সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বর্গমাইলের এ দেশটি উত্তরে ৬০ থেকে ৭০ দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর সীমান্ত নরওয়ে, সুইডেন ও রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। রাশিয়ার প্রসিদ্ধ শহর সেন্ট পিটার্সবার্গ (যার নাম সোভিয়েতের ক্ষমতা চলাকালে 'লেনিনগ্রাদ' ছিল) হেলসিংকি থেকে কারযোগে মাত্র দু' ঘন্টার দূরত্বে অবস্থিত। দেশের প্রায় দশ শতাংশই পানি। দশ হাজার ঝিল দেশের দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছড়িয়ে আছে। তবে অধিবাসী মাত্র সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন (৫৫ লক্ষ)। অর্থাৎ করাচী শহরের অর্ধেক থেকেও কম। শৈল্পিক উন্নতিতে দেশটি ইউরোপের অন্যান্য দেশের সমানে সমানে চলছে। এখানে মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা মত কাজ চলছে। জনগণের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণটাই বিনামূল্যে। চিকিৎসা ব্যবস্থাও সহজলভ্য। দেশের অধিবাসীদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সস্তামূল্যে বাড়ী ক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এক সময় পর্যন্ত ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার শাসনাধীনে ছিল। তবে এখন সে সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ।

হেলসিংকী ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী। ছোট তবে সুন্দর এবং সমস্ত

আধুনিক নগরায়নিক সুবিধাদি দ্বারা সজ্জিত এ শহর। যেদিন আমরা এ শহরে অবস্থান করছিলাম সেদিন প্রত্যেককে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আজ এ ঋতুর সর্বাধিক গরম দিন। অথচ তাপমাত্রা সেদিন মাত্র ২৮ ডিগ্রীতে পৌঁছেছিল। আমাদের কাছে তা ভারসাম্যপূর্ণ ও মধুময় মনে হচ্ছিল। ফিনল্যাণ্ডে প্রায় ১২ হাজার মুসলমান অধিবাসী রয়েছে। তাদের মধ্যে সোমালিয়ানদের সংখ্যাই সর্বাধিক অর্থাৎ পাঁচ হাজার তিনশ' একাত্তর জন, ইরাকের দুই হাজার ছয়শ' সত্তর, তুরস্কের এক হাজার সাতশ' সাইত্রিশ, ইরানের এক হাজার সাতশ' ছয়, বসনিয়ার এক হাজার চারশ ছিয়ানব্বই, যুগোশ্লাভিয়ার দুই হাজার পাঁচশ' আঠারো, পাকিস্তানের দু'শো, হিন্দুস্তানের পাঁচজন এবং বাংলাদেশের চল্লিশ-পঞ্চাশ জন মুসলমানও এখানে আবাদ রয়েছে। হেলসিংকীতে ছয়-সাতটি মসজিদ রয়েছে। তার মধ্যে একটি মসজিদ পাকিস্তানীদেরও রয়েছে। তবে সে মসজিদটি ভাড়া বাড়ীতে। তাই তাকে নামাযের জায়গা বলাই অধিক সমীচীন। মসজিদের ইমাম মাওলানা আশরাফ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত হল। তিনি লাহোরের জামেয়া নাঈমিয়া থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। তিনি ইংরেজী ও স্প্যানিশ ভাষা খুব ভালভাবে অবগত। আমি ঐ মসজিদে গেলে তিনি বলেন, এখানে যোহর ও আসরের নামায তো নিয়মতান্ত্রিকভাবে জামাআতের সাথে পড়া হয়, তবে অন্যান্য নামাযের সময় লোকেরা অনেক দূরে চলে যায়, তাই সে সমস্ত নামায নিয়মতান্ত্রিকভাবে হয় না। অনেক সময় এমনও হয় যে, কেউ ইমাম সাহেবের বাড়ীতে ফোন করে বলে যে, আমি মাগরিব নামাযে আসতে চাই। তখন তিনি গিয়ে মসজিদ খুলে দেন এবং জামাআতে নামায হয়। সরকারের পক্ষ থেকে কারাবন্দী মুসলমান কয়েদীদের জন্য সপ্তাহে একবার পাঠদান ব্যবস্থা রয়েছে। মাওলানা আশরাফ সাহেব সাপ্তাহিক এ পাঠদান করে থাকেন। এছাড়া সাধারণ স্কুলসমূহেও সপ্তাহে একদিন ধর্মীয় শিক্ষার অধীনে ইসলাম সম্পর্কে শিশুদেরকে জ্ঞান দান করার জন্য একটি করে প্রিয়ড রয়েছে। অধিকাংশ সোমালিয়ান উস্তাদ এই প্রিয়ডে শিশুদেরকে ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান দান করে থাকেন।

হেলসিংকীতে 'মারকাযুদ দাওয়াতিল ইসলামিয়্যাহ' নামে আরেকটি

মসজিদ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সাধারণতঃ এটিকে 'মসজিদুল ঈমান' বলা হয়। ঘানার মুহাম্মাদ শরীফ সাহেব নামক একজন মুসলমান কুয়েতের সহযোগিতায় এটি তৈরী করেছেন। 'রাবেতাতুল ইসলামিয়্যাহ' নামে অপর একটি মসজিদ উস্তাদ খিযির শিহাবের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আমার সেখানেও যাওয়ার সুযোগ হয়। এখানে রবিবারে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কিছু শিশু প্রতিদিনই পড়তে আসে। এর সঙ্গে একটি পাঠাগার ও ধর্মীয় পুস্তক বিক্রির দোকানও রয়েছে। হালাল গোশতের একটি রেস্তোরাঁও রয়েছে।

হেলসিংকীতে একদিন অবস্থান করার পর আমরা ঐ জলজাহাজেই ষ্টকহোমে ফিরে আসি। ষ্টকহোম থেকে পুনরায় ট্রেনযোগে ওসলো পৌছি। ওসলোতে পূর্ণ দু'দিন বিশ্রাম করি এবং সেখানেই এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের সূচনা করি।

১লা আগষ্টে আমি লণ্ডন পৌছি। সেখানে আমার বন্ধু জাফর সারিশওয়ালা সাহেব আমার সঙ্গে কিছু বিষয়ে পরামর্শ করতে চান। কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাঁর পরামর্শ শেষ হয়ে যায়। লণ্ডনে অবস্থানের দ্বিতীয় দিন আমার পুরোটাই খালি ছিল। কারণ, আমাকে বিকাল ৬টায় করাচীর উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা করতে হবে। এই দিনটি আমি বৃটিশ লাইব্রেরীতে ব্যয় করি। পূর্ব লণ্ডনের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তাকারে অনেকগুলো গ্রন্থাগার ছিল। এখন বৃটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী প্রভৃতি সবগুলোকে একত্রিত করে কিং ক্রস রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে বড় একটি ভবনে 'বৃটিশ লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমি তার মেম্বারশীপ পাস বানিয়েছি। লণ্ডনে এসে যখনই অবসর মিলে ঐ পাস বইকে কাজে লাগিয়ে লাইব্রেরী ঘুরে দেখি।

এবার আমার লক্ষ্য ছিল, হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরনিভী (রহঃ)এর 'ইযহারুল হক' গ্রন্থে (যার উর্দূ অনুবাদ আমার গবেষণা সহ 'বাইবেল সে কুরআন তাক' নামে প্রকাশ করেছি) যে সমস্ত ইংরেজী বইয়ের উদ্ধৃতি এসেছে, সেগুলো অনেক পুরাতন হয়ে গেছে। সেগুলোর মূল ইংরেজী পুস্তক পাওয়া যায় না। এমনকি যখন 'ইযহারুল হক' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করা হয়, তখন তাতেও ঐ সমস্ত উদ্ধৃতি আরবী থেকে অনুবাদ করে তুলে ধরা হয়। মূল বইয়ের উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ সমস্ত পুরাতন বই পুরাতন কোন গ্রন্থাগারেই পাওয়া সম্ভব। এবার আমার উদ্দেশ্য ছিল, বৃটিশ লাইব্রেরীতে এ সমস্ত বই সন্ধান করা। এসব বই পাওয়া গেলে লণ্ডনে কাউকে এ কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করব যে, তিনি এ সমস্ত উদ্ধৃতির মূল ইংরেজী বক্তব্য সংগ্রহ করবেন।

আমার বন্ধু মাওলানা ইসমাঈল গঙ্গাত এবং বালহিম মসজিদের ইমাম মাওলানা সেকান্দার সাহেব আমার অনুরোধে আমার সঙ্গে লাইব্রেরীতে যান। আমি এ উদ্দেশ্যে কয়েক ঘন্টা সময় বৃটিশ লাইব্রেরীতে অতিবাহিত করি। এখন বেশীর ভাগ লাইব্রেরী কম্পিউটারাইজড হয়েছে। সেগুলোতে কম্পিউটারের সাহায্যে বই তালাশ করতে হয়। তবে এ বিষয়টি কম্পিউটারের প্রোগ্রাম তৈরীকারীর উপর নির্ভর করে। যে লাইব্রেরীতে যত সহজ প্রোগ্রাম তৈরী করা হয়, সেখান থেকে তত সহজে বই খুঁজে বের করা যায়। বৃটিশ লাইব্রেরীতে জনৈক ব্যক্তি কম্পিউটারের এ প্রোগ্রামটি অনেক জটিল করে ফেলেছে, যার ফলে বইয়ের অনুসন্ধান এত সহজ নেই, যতটুকু কম্পিউটার থেকে আশা করা হয়। তারপরও আলহামদুলিল্লাহ, আমার কাংখিত কিছু বই পেয়ে যাই। সেগুলোর উদ্ধৃতি আমি নোট করি। তাছাড়া 'ইযহারুল হক' গ্রন্থের একটি ফরাসী অনুবাদও আমি এখানে পেয়ে যাই। প্রায় দশ/পনের বছর পূর্বে আমাকে ডঃ হামিদুল্লাহ সাহেব লিখেছিলেন যে, প্যারিসের একটি গ্রন্থাগারে তিনি 'ইযহারুল হকের' ফরাসী অনুবাদ দেখেছেন। যা ছিল অসম্পূর্ণ। কিন্তু আমি নিজে এ পর্যন্ত এটা দেখি নাই। আজ আমি সরাসরি তা দেখার সুযোগ লাভ করি, যার নাম Idhharulhaqq ou Manifestaion be la verite.

এর অনুবাদকের নাম Carlerri.V.P। এটি বাহ্যতঃ দুই খণ্ডেই পরিপূর্ণ একটি কপি এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে Paris errest leroux থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বৃটিশ লাইব্রেরীতে এর shelf mark নাম্বার ১৪৫০৫ d2। আমি লাইব্রেরীকে এই বইয়ের একটি মাইক্রোফিল্ম কপি করানোর অর্ডারও দিই। তারা পঁচিশ দিনের মধ্যে তার মাইক্রোফিল্মের কপি আমার করাচীর ঠিকানায় পাঠানোর ওয়াদা করে।

এভাবে বৃটিশ লাইব্রেরীর এই ভ্রমণ উপকারী প্রমাণিত হয়। এখন আমি লণ্ডনে অবস্থানকারী এমন কোন রুচিশীল লোকের তালাশে আছি, যিনি 'ইজহারুল হকের' উদ্ধৃতসমূহের এ কাজ বৃটিশ লাইব্রেরীর সাহায্যে পূর্ণ করতে পারবেন। আমার সেখানের কিছু বন্ধুকেও এ কাজের কথা বলেছি। যদি এমন কোন ব্যক্তি আমার লেখা পড়ে থাকেন, যিনি এই কাজ করতে সক্ষম, তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ইনশাআল্লাহ তাকে এই কাজের যথার্থ পারিশ্রমিক পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা হবে।

এদিন বিকেলেই আমি বৃটিশ এয়ারওয়েজ যোগে করাচীর পথে দুবাই রওয়ানা হই।

সার্বিক প্রতিক্রিয়া

এবারের সফরে আমার একাধারে তিন সপ্তাহ সময় ইউরোপের চারটি দেশে অতিবাহিত হয়। যার বেশীর ভাগ ছিল বিনোদনমূলক। এবারের সফরের উদ্দেশ্যই ছিল মস্তিস্ককে কিছুদিন কাজের ব্যস্ততা থেকে মুক্ত করে অবসরে কাটানো। তবে এর সাথে কিছু সমাবেশে অংশগ্রহণও করা হয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্র কুরআনের 'সূরায়ে হজ্জের' অর্ধাংশ এবং 'সূরা আল মু'মিনূনের' অর্ধাংশের বেশী ইংরেজী অনুবাদও এই সফরের মধ্যেই করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। তবুও সফরের সিংহভাগ বিনোদনমূলক ছিল বিধায় ইউরোপের এ সমস্ত দেশকে সবিশেষ নিকট থেকে এবং দীর্ঘসময় পর্যন্ত দেখার সুযোগ লাভ হয়। চিরাচরিতের ন্যায় এবারেও ইউরোপের বিপরীতমূখী বৈশিষ্ট্যাবলী আমার দৃষ্টিগোচর হয়। কিছু কিছু বিষয়ে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা করতে মন চায়। তারা স্ব স্ব দেশে যে সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধের প্রসার ঘটিয়েছে এবং শ্রম, সাধনা ও জাতীয় সমবেদনার আবেদন দেশের অধিবাসীদেরকে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, মানবতার মূল্যায়ন ও তার মানবিক মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য যেই সার্বিক কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। সেখানকার শাসক শ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে অস্বাভাবিক দূরত্বও নেই। গতবছর ওসলোতে আমি ডাক্তারদের যে সমাবেশে বক্তব্য রেখেছিলাম, তাতে সেখানকার গভর্নর একজন সাধারণ

লোকের ন্যায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আহারের সময় হলে তিনি খোলামেলাভাবে আমার সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে প্লেটে খাবার নিয়ে আমার টেবিলে চলে এসে আমার পাশে বসেন। যাওয়ার সময় হলে সহজ-সরল ভাবে উঠে গিয়ে তার কারে উপবেশন করেন। প্রোটোকলের যেই ঠাটবাট আমাদের দেশে প্রচলন পেয়েছে, তা সেখানে না থাকারই মত।

হেলসিংকীতে (ফিনল্যাণ্ডে) বিকেল বেলা পদচারণার জন্য আমি পার্লামেন্ট স্কয়ারে বের হয়ে অল্পক্ষণ পর দেখতে পাই যে, পতাকাধারী একটি গাড়ী সিগন্যালের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল এবং সাধারণ গাড়ীসমূহের সঙ্গে চলে গেল। পরে জানতে পারি যে, এটি এখানকার প্রধানমন্ত্রীর গাড়ী ছিল এবং সে তাতে উপস্থিতও ছিল। তার আগে পরে না কোন পাইলট দেখতে পেলাম, না পুলিশের গাড়ী দেখতে পেলাম। এখানকার লোকেরা বলল যে, কিছুদিন পূর্বে এই প্রধানমন্ত্রী (তিনি একজন মহিলা) কিছু একটা ক্রয় করার জন্য একটি সুপারমার্কেটে গিয়ে সাধারণ লোকদের সঙ্গে লাইন ধরে থাকেন এবং যখন তার পালা আসে তখন তা ক্রয় করেন।

মোটকথা, সরলতা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুব্যবস্থাপনা, কায়-কারবারে নির্মলতা এবং আমানত ও দায়িত্ববোধের বহিঃপ্রকাশ প্রায় প্রতিদিনই আমাদের চোখে পড়ে এবং অনুভূত হয় যে, এ সমস্ত গুণ এখানকার সমাজে খুব ভালভাবে প্রবিষ্ট করা হয়েছে। সত্যি কথা এই যে, এসব গুণই এ সমস্ত জাতিকে বিশ্ব আসরে উন্নতি দান করেছে। আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ) বড় দামী কথা বলতেন যে, 'বাতিলের মধ্যে উন্নতি করার নিজস্ব কোন শক্তি নেই। কারণ পবিত্র কুরআন এরশাদ করেছে—

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

'নিশ্চয় বাতিল তিরোহিত হবেই'। বিধায় কোন বাতিল সম্প্রদায়কে যদি উন্নতি করতে দেখো তাহলে বুঝে নিবে, কোন সত্য তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। যার শক্তিতে সে উন্নতি করছে। কাজেই যেই পাশ্চাত্য জগতকে বিশ্বের বুকে উন্নতি করতে দেখা যাচ্ছে, তা তাদের বাতিল আকিদা ও

ভ্রান্ত মতাদর্শ কিংবা পাপ পঙ্কিলতার কারণে নয়, বরং তারা ঐ সমস্ত গুণের কারণে উন্নতি করছে, যেগুলো হক ও সত্য এবং যেগুলোর ফল ন্যুনতম পক্ষে ইহকালে পাওয়া যায়। মূলতঃ এ সমস্ত গুণ ইসলামী শিক্ষারই অংশ। তবে আফসোসের বিষয় হল, আমরা সেগুলো পরিত্যাগ করেছি আর এ সমস্ত জাতি সেগুলোর উপর আমল করে উন্নতি লাভ করছে।

অন্যদিকে এ সমস্ত জাতিরই কিছু বৈশিষ্ট্য এমনও রয়েছে যেগুলো দেখে মনে হয় যে, এরা বাস্তব অধঃপতনের ক্ষেত্রে পশুর পর্যায় থেকে যেমন নীচে নেমেছে, তেমনি তারা তাদের আকীদার দিক থেকে নিবুদ্ধিতা ও হঠকারিতার চূড়ান্তে পৌঁছেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বের চুলচেরা গবেষণা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তারা এই ঈমান ও বিশ্বাসের দৌলত থেকে বঞ্চিত যে, বিশ্ব চরাচরের বিস্ময়কর এই ব্যবস্থাপনা কোন স্রষ্টার পূর্ণ ক্ষমতা ও নিপুণ কর্মকুশলতা ভিন্ন অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। আর সেই স্রষ্টারই অধিকার যে, তিনি মানবকে পৃথিবীর বুকে জীবন যাপনের পদ্ধতি বলে দিবেন। সুস্পষ্ট এই চূড়ান্ত বিষয়টি এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞান ও শিল্পকলার এই হিরোদের বুঝে আসেনি। এখানে এসে তাদের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান হাওয়া হয়ে যায়।

অপরদিকে নিজ নিজ দেশে আরাম-আয়েশের তাবৎ উপকরণসমূহের সমন্বয় ঘটানো সত্ত্বেও তারা নিজেদের সমাজ কাঠামোকে চরমভাবে ধ্বংস করে ফেলেছে, যা প্রত্যেক দৃষ্টিবানের জন্য একটি শিক্ষণীয় পাঠ। আমি কোথাও পড়েছিলাম যে, নরওয়ের অধিবাসীদের সামান্য সংখ্যক বিবাহিত, যার অর্থ এই যে, সিংহভাগ অধিবাসী বিবাহ ছাড়া স্বাধীন জীবনযাপন করছে। পারিবারিক জীবনের ধারণাই তাদের থেকে বিলুপ্ত হয়ে চলেছে। মাতাপিতা ও ভ্রাতা-ভগ্নির সম্পর্ক তার মধুরতা হারিয়ে ফেলেছে। প্রত্যেকে অর্থ উপার্জনের ব্যস্ততায় লিপ্ত। প্রত্যেকের চেষ্টা-সাধনা ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। সামাজিক জীবনে অতিথি ও অতিথিপরায়ণতার ধারণাই তাদের নেই। জনসমক্ষে অশ্লীলতা কোনরূপ দোষণীয় নয়। সমকামিতার অভিশাপ মানব প্রকৃতিকে বিকৃত করে ফেলেছে। সারাবিশ্বে নেশাবিরোধী আন্দোলনকারীরা এবং নেশাকর বস্তুকে

অপরাধ গণ্যকারীরা ছুটির রাতে গ্লাস গ্লাস মদ উজাড় করতে থাকে এবং মাতাল অবস্থায় এমন সমস্ত আচরণ করতে থাকে, যার কারণে তাদের আর পশুদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। হেলসিংকী যাওয়ার বিবরণে জাহাজের যেই সুন্দর সফরের বর্ণনা আমি করেছি, তার ভয়ংকর দিক এই ছিল যে, রাতের বেলা প্রায় সকলে নেশায় মাতাল হয়ে পাশবিকতার এমন ঢল ছুটিয়েছিল যে, আমাদের জন্য কেবিন থেকে বের হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই দুআ বের হয়ে আসে—

الحمد لله الذى عافانا مما ابتلاهم به

'সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে পরিত্রাণ দিয়েছেন ঐ সমস্ত নোংরামী থেকে, যাতে তারা লিপ্ত রয়েছে।'

এ হিসাবে তাদের জীবন উভয় দিক থেকে শিক্ষার উপকরণ। তাদের জীবনের প্রথমোক্ত দিকটি প্রশংসা ও অনুকরণযোগ্য, আর এ দিকের বদৌলতেই তাদের উন্নতি লাভ হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় দিকটি চরম ঘৃনার্হ ও পরিত্যাগ যোগ্য। যা তাদেরকে উন্নতি দেয়নি বরং ধ্বংসের শেষ প্রান্তে উপনীত করেছে। মরহুম ইকবাল ঠিকই বলেছেন—

قوت مغرب نہ از جنگ و رباب
نے ز رقص دختران بے حجاب
نے ز سحرِ ساحرانِ لالہ روست
نے ز عریاں ساق و نے از قطعِ موست
قوت افرنگ از علم و فن است
از ہمیں آتش چراغش روشن است

"পাশ্চাত্যের শক্তি রণ ও বাদ্যের ফল নয়।
উলঙ্গ নারীদের নৃত্যের ফল নয়
পুষ্পরূপী জাদুকরদের জাদুর ফল নয়।
উলঙ্গ উরু ও দাড়ি চাঁচার ফল নয়
ফিরিঙ্গি শক্তি জ্ঞান ও শিল্পের ফল
এ অগ্নিতেই তাদের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত।"

আরেক জায়গায় বলেন—

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

"নক্ষত্রের কক্ষপথের অন্বেষণকারীরা
নিজেদের চিন্তার জগতে ভ্রমণ করতে পারেনি
যারা সূর্যকিরণকে বন্দী করল, তারা
জীবনের অন্ধকার নিশিকে আলোকিত করতে পারেনি।"

এ সময় আমাদের দেশ পাকিস্তানে বিশেষভাবে এবং অধিকাংশ ইসলামী দেশে সাধারণভাবে একটি ঊর্ধ্বমুখী ঝোঁক এই বিরাজ করছে যে, মানুষ স্বদেশভূমি ছেড়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহের অধিবাসী হতে চায়। এতে সন্দেহ নেই যে, আমাদের দেশসমূহের অবস্থা এমন অনির্বচনীয় যে, না সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা আছে, না সসম্মানে উপার্জনের পথ আছে, না যোগ্যতা ও শ্রমের যথার্থ মূল্যায়ন আছে। ন্যায়বিচার সেখানে বিলুপ্ত। অরাজকতা সেখানে প্রতিষ্ঠিত। মানুষ এসব থেকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বের হয়ে আসতে চায়। কিন্তু আমি পশ্চিমা দেশসমূহে প্রতিবছর কয়েকবার করে ভ্রমণ করি। আল্লাহর মেহেরবানীতে সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। আমার সুচিন্তিত মত এই যে, এ সমস্ত দেশ একজন মুসলমানের স্থায়ীভাবে বসবাসের যোগ্য মোটেই নয়। কোন অপারগতা বা উচ্চতর কোন লক্ষ্য সামনে এলে সে তো ভিন্ন কথা। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় এখানে নিয়মিত অবস্থান করা এমন কোন বিষয় নয়, যার জন্য দৌড়-ঝাঁপ করতে হবে। আমাদের দেশে যাবতীয় মন্দাবস্থা বিরাজ করা সত্ত্বেও একজন মুসলমানের জন্য তা অনেক গনীমত।

প্রথম কথা তো এই যে, ঐ সমস্ত দেশে নিঃসন্দেহে নাগরিক সুবিধাদি এখান থেকে অনেক বেশী লাভ হয় (তাও আবার সবার ক্ষেত্রে নয়)। কিন্তু বহিরাগত মানুষ শেষ জীবন পর্যন্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর

নাগরিক রূপে গণ্য হয়। তারা সারাজীবনেও সেই স্থান লাভ করতে পারে না, যা এখানকার মূল অধিবাসীদের রয়েছে। দ্বিতীয় কথা এই যে, এ সমস্ত নাগরিক-সুবিধা মানুষ সাধারণতঃ নিজের দ্বীন, মূল্যবোধ ও নিজের সন্তানদের আত্মার ভবিষ্যত ধ্বংসের বিনিময়ে লাভ করে থাকে। শিশু এবং বিশেষতঃ মেয়ে শিশুদের প্রতিপালন এসব দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যা। সামগ্রিকভাবে এখনও পর্যন্ত যার কোন সমাধান নেই। মা-বাবা সন্তানদেরকে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পড়াতে বাধ্য। যেখানকার পাঠ্যক্রম, শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবেশ আত্মমর্যাদাশালী একজন মুসলমানের জন্য প্রায় অসহনীয়। যেখানে শিক্ষা পাওয়ার পর বিরাট সংখ্যক সন্তান মা-বাবার হাত থেকে প্রায় হাতছাড়া হয়ে যায়। প্রচার মাধ্যমসমূহের অবস্থা এই যে, সেগুলো শিশুদেরকে জীবনের প্রারম্ভ থেকেই নিজেদের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শিক্ষা দেয়।

তৃতীয় বিষয় এই যে, অনেক পাশ্চাত্য শহরে মসজিদ ও ইসলামী সেন্টারসমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সেসব দেশের অধিকাংশ অধিবাসী আযানের আওয়াজ শোনা থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত থাকে। মসজিদের নিকটে বাড়ী না হলে অনেক লোক জামাআতে নামায পড়া বরং জুমুআ থেকেও বঞ্চিত থাকে। মানুষের মন থেকে আল্লাহ না করুন, হালাল-হারামের চিন্তা বিলুপ্ত হয়ে গেলে তো ভিন্ন কথা, কিন্তু কারো অন্তরে এই চিন্তার বিন্দুমাত্র স্পন্দন থাকলে তার জন্য পদে পদে সমস্যা সৃষ্টি হয়। সফর অবস্থায় হালাল খাবার পাওয়া এক জটিল সমস্যা। ...... তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা এই যে, পাশ্চাত্যবাসীর জীবনের ঐ সমস্ত নেতিবাচক দিক—যেগুলো আমি এই মাত্র উল্লেখ করলাম—দিবস-রজনী দেখতে দেখতে চোখ তাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তার মন্দদিকসমূহের অনুভূতি হ্রাস পেতে থাকে। অনেক সময় একেবারে মুছে যায়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে সমস্ত মুসলমান সেখানে গিয়ে বসবাস করছে, তাদের মধ্যে অসংখ্য মুসলমান এমন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন রয়েছেন, যারা অবিচলভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করে নিজেদের ইসলামী স্বকীয়তাকে টিকিয়ে রেখেছেন। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত

মুসলমানের ধর্মীয় অবস্থা ইসলামী দেশসমূহের মুসলমান অধিবাসীদের থেকে অনেক গুণে ভাল। কিন্তু মুসলমান অধিবাসীদের সার্বিক অবস্থার দিকে তাকালে এ অবস্থাকে সিংহভাগ অধিবাসীর সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। যারা সেখানের অধিবাসী হয়ে গেছে, তাদের সংরক্ষণের জন্য এ সমস্ত প্রচেষ্টা অবশ্যই অব্যাহত থাকতে হবে এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে এসবে প্রবৃদ্ধি ঘটছে। তবে আমার নিবেদনের উদ্দেশ্য এই যে, যে সমস্ত লোক এখনও সেসব দেশে যাননি, তাদের জন্য সেখানে গিয়ে স্বতন্ত্র বসবাস এমন কোন আকর্ষণীয় বস্তু নয়,যার জন্য দৌড়ঝাঁপ করতে হবে।

শেষ কথা এই যে, উদাহরণস্বরূপ পাকিস্তানের তেরো কোটি অধিবাসীর সবার জন্য এটি সম্ভব নয় যে, তারা স্বদেশ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে অধিবাসী হবে। আর যদি ভাল ও যোগ্য লোকদের দেশত্যাগ এই গতিতে চলতে থাকে—যেই গতিতে বর্তমানে চালু রয়েছে—তাহলে এ দেশ কে নির্মাণ করবে? দেশের অবস্থা নিঃসন্দেহে ভাল নয়। তবে বিভিন্ন জাতির সম্মুখে এমন সময় এসেই থাকে। তার সমাধান ময়দান ছেড়ে পালানো নয়, বরং অবস্থা সংশোধনের চেষ্টা করা। নিঃসন্দেহে এ দায়িত্ব এক নম্বরে সরকারের, সে দেশের অবস্থাকে ঘৃণার যোগ্য না বানিয়ে আকর্ষণীয় বানাবে। তবে এটি আমাদের সকলেরই দায়িত্ব যে, আমরা নিজ নিজ ক্ষমতার পরিধিতে সত্যের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করবো। আল্লাহ তাআলার নীতি এই যে, এখলাসের সাথে যে প্রদীপ জ্বালানো হয়, তা থেকে আরো প্রদীপ আলোকিত হয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত অন্ধকার বিদূরীত হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ কথা বোঝার, সে অনুপাতে আমল করার এবং তার উপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

জার্মানী ও ইটালীর একটি সফর

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله الكريم،وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين. امابعد.

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর সম্মানিত রাসূলের উপর, তাঁর সমস্ত বংশধর ও সাহাবীদের উপর এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁদের প্রত্যেক নিষ্ঠাবান অনুসারীর উপর।”

জার্মানীর সুপ্রসিদ্ধ Erleangen ইউনিভার্সিটি আমাকে ইসলামী আইনের উপর ভাষণ দানের জন্য দাওয়াত করেছিল। পশ্চিমা দেশগুলোর ইউনিভার্সিটিসমূহে ইসলাম ও ইসলামী দেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও গবেষণার পৃথক বিভাগ রয়েছে। এখানকার জ্ঞান–গবেষণা পাশ্চাত্যে ইসলাম, মুসলমান ও মুসলিম দেশসমূহ সম্পর্কে পশ্চিমা ধ্যান–ধারণার রূপরেখা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পশ্চিমা মিডিয়া ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে যে দায়িত্বহীনতামূলক ও বিভ্রান্তিকর প্রোপাগাণ্ডা করে থাকে, এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান তা দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত হয়। তবে তাদের মধ্যে এমন লোকও অনেক রয়েছে, যারা এ বিষয়ে সত্যনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে তারা যে ধর্ম বা দেশকে আলোচনা ও গবেষণার প্রতিপাদ্যরূপে গ্রহণ করে, তার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদেরকেও নিমন্ত্রণ করে থাকে। যেন নিমন্ত্রিত প্রতিনিধিগণ নিজেদের মতাদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন।

কিন্তু এতদসংক্রান্ত দুঃখজনক দিক এই যে, মুসলিম বিশ্ব থেকে এ পর্যায়ের লোক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে কাজ করা হয় না। বরং সাধারণতঃ এমন স্কলারদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয়, যারা নিজেরা পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার হাতে গড়া এবং তা দ্বারা প্রভাবিত ও হতচকিত হয়ে থাকে। তাই তারা সেখানে যা কিছু ব্যক্ত করে, তা দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয়ে ওঠে না। বরং দৃঢ় বিশ্বাসী

আলেমদের সম্পর্কে যে ধারণা পশ্চিমা মিডিয়া সর্বসাধারণের মনে বিস্তার করিয়েছে, তারই সমর্থন হয়ে থাকে। দৃঢ়বিশ্বাসী জ্ঞানীজনদেরকে কদাচিতই এ ধরনের আলোচনায় নিমন্ত্রণ করা হয়। তাই যখনই আমি এ ধরনের কোন নিমন্ত্রণ পেয়েছি, আমি তা গ্রহণ করেছি এবং তা দ্বারা ফায়দা উঠানোর চেষ্টা করেছি। ইতিপূর্বে আমাকে তিনবার পশ্চিমা দেশসমূহের ইউনিভার্সিটিসমূহে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। একবার হারভার্ড ইউনিভার্সিটির ল' স্কুলের পক্ষ থেকে, একবার লণ্ডন স্কুল অব ইকোনোমিকস (LSE)এর পক্ষ থেকে—যা অর্থনীতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান—এবং তৃতীয়বার লণ্ডনেরই ইনষ্টিটিউট অব মডেল ইষ্টার্ণ ষ্টাডিজের পক্ষ থেকে। তিনবারই আমি উপলব্ধি করি যে, এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্য ব্যর্থ হয়নি। তাই যখন আমাকে জার্মানীর Erleangen ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ করা হল তখন আমি তাদের এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি।

আমাকে ৩রা শা'বান ১৪২৩ হিজরী মোতাবেক ১০ই অক্টোবর ২০০২ খৃষ্টাব্দ, করাচী থেকে জার্মানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়। ঘটনাচক্রে সেদিনই দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। তাই আমি দিনে ভোট দিয়ে রাত সাড়ে দশটায় আমিরাত এয়ারলাইন্সযোগে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সেখান থেকে রাত আড়াইটায় লুফতানসার বিমান পাই। সকাল সাড়ে সাতটায় বিমানটি আমাকে ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌছায়। এই লেকচারে আমাকে নিমন্ত্রিত করার পিছনে একজন আইনজ্ঞ আরব মুসলমান আবদুল আজীজ ইয়াকুতির জোরালো ভূমিকা ছিল। তিনি মূলতঃ কুয়েতী, কিন্তু বহুদিন ধরে জার্মানীতে বসবাস করছেন। তার মা–ও জার্মান বংশোদ্ভূত মুসলমান। তিনি এখানে কর্পোরেট ল' বিভাগে কাজ করছেন। Erleangen ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে তিনি ইসলামিক ষ্টাডিজের একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রথমে ধারণা করেছিলাম যে, আমার এ লেকচার ইউনিভার্সিটির সাধারণ লেকচারের মতই হবে। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ইসলামিক ষ্টাডিজের সেই বিভাগের পক্ষ থেকে একে একটি সিম্পোজিয়ামের রূপ দেন। তাতে ইউরোপের অন্যান্য ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদেরকেও নিমন্ত্রণ করা হয়।

ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে ইয়াকুতি সাহেবের সহকর্মী মিষ্টার ক্রাজ্ঞগাসকে আমাকে স্বাগত জ্ঞাপনকারী ও সহচর নির্ধারণ করা হয়েছিল। তিনিই ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে আমাকে স্বাগত জানান। এই জার্মান তরুণ সাবলিলভাবে ইংরেজীতে কথা বলেন বিধায় কোন সমস্যা হয়নি। পুরো সফরটিতে তিনি আমার আতিথ্য, পথপ্রদর্শন ও অতিথি পরায়ণতায় কোন ক্রটি করেননি। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আমাদেরকে ট্রেনযোগে ন্যুরেমবার্গ (Nuremberg) যেতে হবে। আমি ষ্টেশনে পৌছার পূর্বে একটি ট্রেন রওয়ানা হয়ে গেছে। অপরটি নয়টার দিকে রওয়ানা হবে। তাই আমাদেরকে প্রায় দেড় ঘন্টা সময় বিমানবন্দর রেলওয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে হয়। এ সময় আমি ফ্রাঙ্কফুর্টের কিছু বন্ধুকে ফোন করতে গিয়ে জানতে পারলাম যে, আমার কাছে যে নম্বরগুলো রয়েছে, সেগুলো পুরাতন। এখন তা পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে তাদের সাথে যোগাযোগ করা হল না।

নয়টায় ট্রেনে আরোহণ করি। প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় ট্রেনে কাটাই। আমি ফ্রাঙ্কফুর্টে ইতিপূর্বেও বেশ কয়েকবার এসেছি। তবে জার্মানীর ভিতরে যাওয়ার সুযোগ এবারই ছিল প্রথম। জার্মানীকে আল্লাহ তাআলা অপার নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভূষিত করেছেন। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন আরামদায়ক ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর এই সফর খুবই মনোমুগ্ধকর ছিল। আবহাওয়া শীতল ও মেঘাচ্ছন্ন ছিল। ট্রেনের কাঁচে পরিদৃষ্ট সবুজ পাহাড়, উপত্যকা ও নিবিড় বন নয়নে পুলক সৃষ্টি করছিল। পথিমধ্যে কয়েকটি শহরও অতিক্রম করে। অবশেষে প্রায় সাড়ে এগারোটায় আমরা ন্যুরেমবার্গ পৌছি। আরলেনগান শহর—যার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত—কারযোগে ন্যুরেমবার্গ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট দূরত্বের পথ। আমার মেজবান আরলেনগানের পরিবর্তে ন্যুরেমবার্গের 'আরাবিলা শেরাটন' হোটেলে থাকার ব্যবস্থা সম্ভবতঃ এ কারণে করেছিলেন যে, আরলেনগান শহরটি ছোট এবং ফ্রাঙ্কফুর্টের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন ন্যুরেমবার্গ থেকে অধিকতর সহজ ছিল। আরাবিলা শেরাটন হোটেল শহরের ঠিক মধ্যভাগে রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটেই অবস্থিত। তাই আমাদের সেখানে পৌছতে বিলম্ব হল না।

মিঃ ক্রাজ্ঞগাস আমাকে হোটেল কক্ষে পৌছে দেন। দীর্ঘ সফরের পর কিছু সময় বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেদিন ছিল জুমুআ বার। তাই মিঃ ক্রাজ্ঞগাস এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, তিনি জুমুআর নামাযের সঠিক সময় অবগত হয়ে আমাকে কোন একটি মসজিদে নিয়ে যাবেন। ততক্ষণ সময় আমি বিশ্রাম করি, যতক্ষণের মধ্যে তিনি মসজিদের ঠিকানা খুঁজে বের করেন। আমরা একটার সময় একটি ট্যাক্সি করে মসজিদে যাই। মাশাআল্লাহ, মসজিদ নামাযী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তুর্কি বংশোদ্ভূত একজন আলেম জুমুআর খুৎবা দিতে আরম্ভ করেন। তারপর আলহামদুলিল্লাহ, ধীরে সুস্থে জুমুআর নামায আদায় করা হয়। মসজিদে বেশীর ভাগ মুসলমান ছিল আরব ও তুর্কি। কয়েকজন পাকিস্তানীর সঙ্গেও মসজিদে সাক্ষাত হয়। তারা আমাকে চিনত না। করাচী থেকে রওয়ানা হওয়ার পর আমার নির্বাচনের ফলাফল জানার চিন্তা ছিল। ন্যুরেমবার্গের হোটেলে পৌছার পর লণ্ডনে আমার বন্ধু সাঈদ আহমাদের নিকট আমার ফোন করার প্রয়োজন ছিল। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নির্বাচনের ফলাফলের কোন সংবাদ আছে কি? তিনি উত্তরে আনন্দের সাথে জানালেন যে, মুত্তাহিদা মজলিসে আমল এখন পর্যন্তের সংবাদ অনুপাতে চল্লিশোর্ধ আসন জিতেছে। মসজিদে এই পাকিস্তানী লোকদের সাথে যখন সাক্ষাত হল, তখন আমি তাদেরকে নির্বাচন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। যুবকগুলো উত্তর করল 'কিতাবওয়ালারা জিতে চলেছে।' নামাযের পর যখন হোটেলে পৌছি, তখন সেখানে সি.এন.এন-এ সংবাদ সম্প্রচারিত হচ্ছিল যে, 'আফগানিস্তান সংলগ্ন দু'টি প্রদেশে তালেবানের পৃষ্ঠপোষক ইসলামপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে।' পরে বাড়ীতে ফোন করে বিস্তারিত জানতে পারি এবং আল্লাহর শোকর আদায় করি।

জুমুআর দিন সেখানে আমার বিশেষ কোন কাজ ছিল না। তাই মাআরিফুল কুরআনের অনুবাদের সংশোধনী কাজে লিপ্ত হই। যা বেশীর ভাগ সফরে আমার সঙ্গে থাকে এবং এ সময় সূরায়ে 'সাবা'র কাজ চলছিল। আসর নামাযের পর মিঃ ক্রাজ্ঞগাস বললেন যে, ন্যুরেমবার্গ খুব সুন্দর একটি শহর। আপনি চাইলে অল্পক্ষণ ঘুরে দেখা যায়। সুতরাং

তিনি আমাকে শহরের দর্শনীয় স্থানসমূহ ঘুরে দেখান।

এই শহরের নাম জার্মান উচ্চারণে 'নিয়র্নবার্গ' আর ইংরেজী উচ্চারণে 'ন্যুরেমবার্গ' (Nuremberg)। শহরটি পেগনিট্জ (Pegnitz) নদীর উভয় দিকে অবস্থিত। এটি জার্মান সম্রাট তৃতীয় হেনরী একাদশ খৃষ্ট শতাব্দীতে আবাদ করেন এবং এখানে একটি দূর্গ নির্মাণ করেন। এটি দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটি স্বায়ত্বশাসিত রাজ্যরূপেও ছিল। হস্তশিল্পের দিক থেকে শহরটি বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করে। অনেক আবিস্কারক ও বৈজ্ঞানিক এখানে জন্ম গ্রহণ করেন। জার্মানীর ইতিহাসে এদিক থেকেও শহরটির বিশেষ মর্যাদা রয়েছে যে, একে সারাদেশের মধ্যে জ্ঞান ও শিল্পের কেন্দ্র মনে করা হত। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এটি নাজী পার্টির কেন্দ্রও ছিল। এখানকার ভবনসমূহও নির্মাণশৈলীর দিক থেকে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকার বোমাবর্ষণের ফলে সেগুলো মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বা বিধ্বস্ত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শহরটি পুনঃনির্মাণ করা হয়। এখন এটি একটি শিল্পনগরী হিসেবে প্রসিদ্ধ। এখানের কাপড়, চশমা ও রাসায়নিক উপাদান শিল্পসমূহ সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী। এছাড়া এখানকার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বিশ্বব্যাপী খ্যাতিলাভ করেছে।

এ শহরে নির্মাণশৈল্পী ও নিয়ম-শৃঙ্খলার দিক থেকে প্রাচীন ও অধুনার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। আধুনিক অঞ্চলের ভবন ও সড়কসমূহ সমকালীন রুচির তৈরী। কিন্তু শহরের অভ্যন্তরীন অংশে প্রাচীন ঐতিহ্যধারাকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি ঐ সমস্ত এলাকার গলিসমূহ এখনও পর্যন্ত ইটের তৈরী। মনোমুগ্ধকর শীতল ঋতুতে শহরের বিশেষ বিশেষ স্থানের ভ্রমণ বেশ পুলকোদ্দীপক হয়।

পরদিন নয়টার দিকে আমরা কারযোগে আরল্যানগনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। এ শহরটি ন্যুরেমবার্গের উত্তরে অবস্থিত। দূরত্ব পঞ্চাশ-ষাট মাইলের কম হবে না। তবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন সড়ক ও জ্যাম স্বল্পতার কারণে আমরা প্রায় চল্লিশ মিনিটে সেখানে পৌছে যাই। দশ লক্ষের কিছু বেশী অধিবাসীর এই শহরটি ন্যুরেমবার্গ থেকেও প্রাচীন। শহরটি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের কারণে বিখ্যাত। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল

শাখাই রয়েছে। তবে প্রযুক্তির শিক্ষাদানে এটি অধিকতর প্রসিদ্ধ।

এই ইউনিভার্সিটির একটি হলকক্ষে সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল 'পাকিস্তানে ইসলামী আইন ও ফতওয়া।' আমাকে বিশেষভাবে ইসলামী আইনের উপর আলোচনা রাখতে বলা হয়েছিল। আমি আমার বক্তব্যের জন্য কম্পিউটারে একটি প্রেজেনটেশান (Presentation) তৈরী করেছিলাম, যাতে করে সেটি মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে স্ক্রীনে দেখানো সম্ভব হয়। কিন্তু উপস্থিত মুহূর্তে সিম্পোজিয়ামের আয়োজকগণ আমাকে জানান যে, স্ক্রীনে পরিদর্শনের মেশিন ভুল এসেছে। ফল এই হল যে, এমন একটি ইউনিভার্সিটিতে—যেটি টেকনোলজি শিক্ষাদানে প্রসিদ্ধ—একটি টেকনিকের ত্রুটির কারণেই আমি আমার লেকচারের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ স্ক্রীনে তুলে ধরতে পারলাম না। ফলে আমাকে উপস্থিত বক্তব্য দিতে হয়। আমি সংক্ষেপে ইসলামী আইনের স্বরূপ, তার উৎসসমূহ, তার গুরুত্ব এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তা বাস্তবায়নের প্রতি জোর দেওয়ার কারণসমূহ বর্ণনা করি। তারপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, তার আইনগত ইতিহাস এবং ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ধারায় আংশিক পদক্ষেপ ইত্যাদির ইতিবৃত্ত বর্ণনা করি। সমাবেশে উপস্থিতির সংখ্যা বেশী ছিল না। উপস্থিতির সংখ্যা অতি কষ্টে পঞ্চাশ জন হবে। তবে সকলেই উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রফেসর, আইনজ্ঞ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান ছিলেন। তারা ছাত্রদের পরিবর্তে শিক্ষকদের জন্য এই লেকচারের আয়োজন করেছিলেন।

প্রায় এক ঘন্টা সময় আমার আলোচনা চলতে থাকে। মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করা হয়। প্রশ্নোত্তরের ধারাও চলতে থাকে। সমস্ত প্রশ্ন ছিল একাডেমিক ধাঁচের। কোন একটি প্রশ্ন থেকেও কোনরূপ হঠকারিতার লেশ প্রকাশ পায়নি। উপলব্ধি হচ্ছিল যে, সকলেই অভিজাত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। মিডিয়ার প্রোপাগাণ্ডা ও প্রকৃত গবেষণার মধ্যে তারা তফাৎ করতে সক্ষম।

আমাকে ইয়াকুতি সাহেব পরবর্তীতে টেলিফোনে বলেন যে, আপনি চলে যাওয়ার পর আপনার ভাষণের বিভিন্ন দিক পরবর্তী সিম্পোজিয়াম ও ব্যক্তিগত বৈঠকসমূহে আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকে। অনেকে জানিয়েছে

যে, এর দ্বারা তাদের অনেক ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

ঐ দিন বিকেলে মি. ক্রাঙ্গাসের সঙ্গে পুনরায় ট্রেনযোগে ফ্রাঙ্কফুর্ট ফিরে যাই।

ইটালীর সফর

আমি জার্মানী থেকে ১২ই অক্টোবর অবসর হই। ১৬ই অক্টোবর থেকে ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত বৃটেনে আমার কাজ ছিল। সেখান থেকে আমাকে ওয়াশিংটন যেতে হবে। তাই ১৩ থেকে ১৫ই অক্টোবরের তিনদিন আমার হাতে খালি ছিল। যা আমি ইটালী ভ্রমণে ব্যয় করি। আমার বন্ধু সাঈদ আহমাদ সাহেব—যিনি লণ্ডনে বাস করেন এবং তার সঙ্গে আমি স্পেন ভ্রমণ করেছিলাম—আমাকে বারবার বলেছিলেন যে, একবার এমন একটি ভ্রমণের প্রোগ্রাম করুন, যেই প্রোগ্রামে কোন কাজ থাকবে না। এই তিনদিন আমি তার সঙ্গে ইটালীতে কাটানোর প্রোগ্রাম করি। সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, ১২ই অক্টোবর রাতে তিনি লণ্ডন থেকে রোম পৌঁছাবেন আর আমি পৌঁছাবো ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে। সুতরাং এই প্রোগ্রাম মত রাত সাড়ে নয়টায় আমাকে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে রোমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়। আমি সন্ধ্যা সাতটায় ফ্রাঙ্কফুর্ট বিমানবন্দরে পৌঁছে যাই। মধ্যবর্তী সময়টি আমি লাউঞ্জে মাআরিফুল কুরআনের কাজে ব্যয় করি। কম্পিউটারকে আরো চার্জ করি, যাতে করে বিমানেও কাজ করতে পারি। সাড়ে নয়টার সময় লুফতানসার বিমানে রওয়ানা করে রাত সাড়ে এগারোটায় রোম বিমানবন্দরে অবতরণ করি। সামানাপত্র আসতে অস্বাভাবিক দেরী হয়, যারফলে আমি সাড়ে বারোটার পর বিমানবন্দর থেকে বের হতে পারি। বিমানবন্দর থেকে শহরের দূরত্ব ছিল পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার। ফলে রাত একটার পর হোটেল ক্রাউন প্লাজায় পৌঁছতে সক্ষম হই। সেখানে সাঈদ সাহেব আমার প্রতীক্ষায় ছিলেন। সারা দিনের ক্লান্তি আমাকে দ্রুত বিছানায় নিয়ে যায় এবং বিশ্রাম করি।

ভ্যাটিক্যানে

সকালে নাস্তার পর আমরা সর্বপ্রথম ভ্যাটিক্যান যাই। এটি বিশ্বের ক্ষুদ্রতম স্বায়ত্বশাসিত রাজ্য। যা ইউরোপের নেতৃত্বে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। রোমান রাজাগণ যখন থেকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে, তখন থেকে বিরতি দিয়ে দিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের বাদশাহ ও পোপের মধ্যে তীব্র কষাকষি রাজ্যের এককেন্দ্রিকতার জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করে। যদিও খৃষ্টধর্মের প্রসিদ্ধ মতাদর্শ এই ছিল যে, কায়সারকে কায়সারের অধিকার দাও আর গীর্জাকে দাও গীর্জার অধিকার—যার অর্থ হল দেশের রাজনৈতিক প্রধান হবে কায়সার আর ধর্মীয় প্রধান হবে গীর্জার পোপ। কিন্তু বড়রা যথার্থই বলেছেন যে, এক দেশে দুই রাজার সংকুলান হয় না। পোপ ধর্মীয় প্রধান হলেও বাস্তবে তাকে স্রষ্টার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। খৃষ্টীয় বিশ্বাসমতে পোপ জনাব পিটার্স এবং তাঁর মধ্যস্থতায় ঈসা (আঃ)এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। পোপ হওয়ার ফলে তার সম্পর্কে খৃষ্টীয় বিশ্বাস এই যে, সে নিষ্পাপ ও ভুলের উর্ধ্বে (Infallibe)। সুতরাং সে যে নির্দেশ দিবে তা সমস্ত খৃষ্টানদের জন্য খোদাপ্রদত্ত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। তার এই নির্দেশ বা বিধান কেবলমাত্র Interpretor এর মর্যাদায় নয় বরং আইনদাতা ও আইন প্রণেতা (Legislator) রূপে অবশ্য পালনীয় হয়ে থাকে। সেই নির্দিষ্ট বৃত্তও ছিল অস্পষ্ট, যার মধ্যে রাজা ও পোপের ক্ষমতার সীমারেখা নির্ধারণ করা হবে। বিধায় উভয়ের বিধানে সংঘাত সৃষ্টি হওয়া ছিল একটি সহজাত ব্যাপার। রাজা ধর্মীয় নেতা হিসেবে পোপের সম্মান করত এবং তাকে 'পবিত্র পিতা' এর উপাধি প্রদান করত। কিন্তু যখন এই 'পবিত্র পিতা' এমন কোন বিধান জারি করত—যাকে রাজা তার ক্ষমতার গণ্ডিতে নাক গলানো বলে মনে করত, তখন দুইজনের মধ্যে লড়াই বেঁধে যেত। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের শত শত বছরের ইতিহাস রাজা ও পোপের এই সংঘর্ষের কাহিনীতে ভরা।

অবশেষে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ১১ তারিখে ইটালীর সরকার ও পোপের মধ্যে একটি চুক্তির আকারে এই সমস্যার সমাধান বের করা হয়। যাকে Lateran treaty বলা হয়। এই চুক্তির ভিত্তিতে ভ্যাটিকান অঞ্চলকে পোপের কর্তৃত্বে একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও

স্বায়ত্বশাসিত রাজ্যের রূপ দেওয়া হয়। এ রাজ্যটি পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম রাজ্য। যার সৈন্য, মুদ্রা, ব্যাংকিং সিস্টেম, রেডিও ষ্টেশন, টেলিফোন, পোষ্ট অফিস ও অভ্যন্তরিণ আইন-শৃংখলা সবকিছু ইটালীর সাধারণ সরকার থেকে মুক্ত এবং পোপের পরিচালনাধীন। তবে এতটুকু বিষয় রয়েছে যে, যে ব্যক্তির নিকট ইটালীর নাগরিকত্ব বা ভিসা আছে, তাকে সেখানে প্রবেশ করার জন্য ভিসা নিতে হয় না। এভাবে পোপের ক্ষমতাবৃত্তির নিবৃত্তির জন্য এ রাজ্যটি একটি কৌশলরূপে বানানো হয়। যদিও তার আয়তন ও অধিকার বলয় 'সালতানাতে শাহ আলম, দিল্লী তা পালন' থেকেও ক্ষুদ্র। যে সময় ভ্যাটিকান রাজ্য প্রতিষ্ঠার এই চুক্তি সম্পাদিত হয়, তখন ছিল ইউরোপের পুনর্জাগরণের পূর্ণতা লাভের পরবর্তী সময়। লিবারিলিজমের জয়জয়কার চলছিল এবং খৃষ্টধর্ম ও তার পণ্ডিতদের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও নির্যাতনের ফলে ঘৃণা ও বিদ্বেষ এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তা মানুষকে ধর্ম থেকেই বিমুখ করে দেয়। তাই পোপের জন্য তার বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভবপর ছিল না, তাই সম্ভবত তৎকালীন পোপ সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও তার ক্ষমতার স্বীকৃতিদানকেই গনীমত মনে করেন। এভাবে ইটালী সরকার ও পোপের পারস্পরিক সম্মতিতে এ চুক্তি অস্তিত্ব লাভ করে।

ভ্যাটিকান যদিও স্বায়ত্বশাসিত স্বতন্ত্র একটি রাজ্য, তবে অবস্থানস্থলের দিক থেকে তা বর্তমানে রোম নগরীরই একটি অংশ বা একটি মহল্লা। ভ্যাটিকানে প্রবেশ করার পর সর্ববৃহৎ জাঁকজমকপূর্ণ যে ভবনটি চোখে পড়ে তাকে সেন্ট পিটার্স বাসেলিকা (St. Peter's Basilica) বলা হয়। 'বাসেলিকা' ইংরেজীতে বিশেষ এক প্রকারের ভবনকে বলা হয়। আমাদের ভাষায় যার নিকটতম শব্দ 'হাবেলী' হতে পারে। বড় কোন চকের পাশের অর্ধবৃত্তাকারের তিন দরজা বিশিষ্ট ভবনকে 'বাসেলিকা' বলা হয়ে থাকে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ চার্চের সমন্বয় এই 'বাসেলিকাটি'। যা হযরত ঈসা (আঃ)এর সর্বাধিক বিশিষ্ট 'হাওয়ারী' তথা সহযোগী হযরত পিটার্স এর স্মরণে নির্মাণ করা হয়েছিল। হযরত পিটার্স—যাকে বাইবেলের ভাষায় সেন্ট পিটার্স বলা হয়—হযরত ঈসা (আঃ)এর দ্বাদশ হাওয়ারীর অন্যতম ছিলেন। খৃষ্টীয় ইতিহাস অনুপাতে

তিনি হযরত ঈসা (আঃ)কে আকাশে তুলে নেওয়ার পর তাঁর দ্বীনের তা'লিম ও তাবলীগে আত্মনিয়োগ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি দূর-দূরান্ত ভ্রমণ করেন। অবশেষে এ কাজেই তিনি রোমেও আগমন করেন। সেখানে তখন মূর্তি পূজারীদের শাসন চলছিল। তারা তাকে বন্দী করে এ জায়গাতেই শূলীবিদ্ধ করেছিল—যেখানে বর্তমানে সেন্ট পিটার্স বাসেলিকার জমকালো ভবনটি দাঁড়িয়ে আছে। এ ভবনের অভ্যন্তরেই তার কবর আছে বলে বলা হয়।

রোমান ক্যাথলিকদের বিশ্বাস মতে হযরত পিটার্স প্রধান হাওয়ারী ছিলেন। তিনি হযরত ঈসা (আঃ)এর স্থলাভিষিক্ত। খৃষ্টানদের ধারণামতে তিনিই রোমান ক্যাথলিক চার্চের মূল প্রতিষ্ঠাতা। তাই খৃষ্টানরা বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই চার্চটি তারই কবরের পাশে নির্মাণ করে। জনৈক খৃষ্টান ঐতিহাসিক লিখেন ঃ

'যে সময় হযরত পিটার্সকে ভ্যাটিকানের পাহাড়ের উপর শূলীবিদ্ধ করা হচ্ছিল, তখন কেউ অবগত ছিল না যে, শূলীদাতা ব্যক্তিরা এ জায়গাতেই এমন একটি রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করছে, যা আকারে বিশ্বের সর্বক্ষুদ্র ও আধ্যাত্মিক প্রভাব-বলয়ের দিক থেকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজ্য হবে।।'

এ সমস্ত তথ্য খৃষ্টীয় বর্ণনার ভিত্তিতে, অন্যথা প্রকৃত তথ্য এই যে, হযরত ঈসা (আঃ)এর পর তার হাওয়ারীদের ইতিহাসের রেকর্ড নির্ভরযোগ্য পন্থায় সংরক্ষিত হয়নি। আর যা কিছু রেকর্ড রয়েছে, তা পুলশের প্রভাব মিশ্রিত। তাই সেগুলোর উপর নির্ভর করা যায় না।

যাই হোক, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেন্ট পিটার্স বাসেলিকার এই ভবন তার কারুকার্যের উৎকর্ষতা, নির্মাণশৈলীর কমনীয়তা ও রূপ-সৌন্দর্যের অপূর্বতার দিক থেকে একটি জমকালো ভবন। তবে চরম অবিচারের কথা এই যে, হযরত ঈসা (আঃ)—যিনি মূর্তিপূজার বিলোপ সাধনের জন্য তাশরীফ এনেছিলেন, তাঁর নামে নির্মিত এই উপাসনালয়ে এত প্রতিমা ও ভাস্কর্য রয়েছে যে, একে একটি মূর্তিঘর বলে মনে হয়, আর এটিই কারণ যে, বাহ্যিক রূপসৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও এতে উপাসনালয়ের পবিত্রতার স্থলে এক অদ্ভূত ধরনের অন্ধকার অনুভূত হয়।

এ ধরনের স্থানে আল্লাহ তাআলার এই অপার অনুগ্রহ বিশেষভাবে অনুভূত ও অধিকতর ভাস্বর হয়ে ওঠে যে, তিনি আমাদেরকে ইসলামের মত নির্মল ও নিষ্কলুষ সত্যধর্মের হিদায়াত দান করেছেন।

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ

'যদি আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত না করতেন তাহলে আমরা সঠিক পথপ্রাপ্ত হতাম না।'

পোপের সৈন্যবাহিনী—যাদেরকে সুইসগার্ড বলা হয়—পর্যটকদের দ্বারা পরিপূর্ণ এ অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছিল। যে পথটি পোপের বাসস্থানের দিকে গিয়েছে, তার মাথার উভয় দিকে দু'জন সুইসগার্ড এমন নীরব-নিথরভাবে দাঁড়িয়েছিল যে, তাদেরকে একেবারে মূর্তি বলে মনে হচ্ছিল। এমন রাজকীয় দাপট একজন ধর্মীয় নেতার কিভাবে শোভা পায় এবং তা সে কিভাবে হজম করে তা আল্লাহই ভাল জানেন!

তবে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই দেখতে পেলাম যে, চার্চের ভবনে উরু অনাবৃত থাকে এমন শর্ট পোশাক পরিধান করে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। তাই এক লোককে দেখতে পেলাম, সে হাফপ্যান্ট পরে এসেছিল, তবে তার সাথে একটি ব্যাগ ছিল। ব্যাগে একটি ফুলপ্যান্ট ছিল। ভবনে প্রবেশ করার পূর্বে সে ফুলপ্যান্ট পরে নেয়। ভবন পরিদর্শন করে বের হয়ে এসে তা খুলে ফেলে এবং পুনরায় পূর্বের পোশাক পরিধান করে।

ভ্যাটিকানে আরো অনেক ভবন রয়েছে। তার মধ্যে এখানকার জাদুঘর ও গ্রন্থাগার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাদুঘরের প্রতি তো আমার কোন আকর্ষণ ছিল না, তবে এখানকার গ্রন্থাগারটি খৃষ্টধর্ম ও তার ইতিহাস সংক্রান্ত অনেক দুর্লভ গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সম্বলিত ছিল। আমি 'ইযহারুল হক' কিতাবের যে সমস্ত উৎস অন্য কোথাও পাইনি, সেগুলোর ব্যাপারে আমার আশা রয়েছে যে, এ গ্রন্থাগারে সেগুলো অবশ্যই পাওয়া যাবে, কিন্তু এখন লাইব্রেরী থেকে উপকৃত হওয়ার সময় ছিল না। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে কখনোও আমি নিজে কিংবা কোন বন্ধুর মাধ্যমে এখানে ঐ সমস্ত কিতাব সন্ধান করবো।

রোমের ধ্বংসাবশেষ

ভ্যাটিক্যান থেকে বের হয়ে আমরা অপর একটি এলাকায় যাই, যা প্রাচীন রোমীয় মহল্লা ও ভবনসমূহের ধ্বংসাবশেষের সমন্বয় ছিল। এটি বিস্তৃত একটি এলাকা, যেখানে প্রাচীনকালের জমকালো ভবনসমূহের নিদর্শনাবলী দৃষ্টিগোচর হয়। এখানকার একটি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে চতুর্দিকের এ সমস্ত প্রাচীন নিদর্শন ও ধ্বংসাবশেষ দেখলে যৌবনকালে এ এলাকার রূপ-সৌন্দর্য ও শান-শওকত কি পরিমাণ ছিল, তা অনুমিত হয়। কিন্তু আজ এ সমস্ত নিদর্শন পদে পদে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পৃথিবীতে বড় থেকে বড় কোন শক্তিরও অমরত্ব নসীব হয় না।

রোম সাম্রাজ্যের দোর্দণ্ডপ্রতাপ শত শত বছর বিশ্বের বুকে বিরাজ করে। এর সম্রাট ও সেনাপতিদের প্রতিপত্তি এখানে নিজেদের দাপট দেখায়। কিন্তু আজ তা মাটির স্তূপে পরিণত হয়েছে। জীর্ণ এ ধ্বংসাবশেষ তাদের সে প্রতাপের শোকগাঁথা গাইছে—

جو مرکز الفت تھے، جو گلزار نظر تھے
سڑتے ہیں تہ خاک وہ اجسام بتاں آج
وہ دبدبہ جن کا تھا کبھی دشت وجبل میں
حسرت کے کھنڈر ہیں وہ محلات شہاں آج
جن باغوں کی نکہت سے معطر تھیں فضائیں
ہیں مرثیہ خواں ان پہ بلبلوں کی زباں آج

"যারা প্রেমের আকর ও নয়নের পুষ্পোদ্যান ছিল
সেই প্রিয়তমের দেহ আজ মৃত্তিকাতলে পঁচছে।
পাহাড়ে-প্রান্তরে যাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিরাজিত ছিল,
সেই রাজপ্রাসাদসমূহ আজ অনুতাপের ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে।
যে সমস্ত পুষ্পকাননের মধুঘ্রানে পরিবেশ মধুময় ছিল
বুলবুলি আজ তাদের শোকগাঁথা গাইছে।"

এ অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষের এ ধারা জগৎখ্যাত সেই কোলোসিয়াম

পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে, যার প্রাচীরসমূহের চিত্র সারা পৃথিবীতে রোমের প্রতীকরূপে পরিচিত। এটি একটি ঐতিহাসিক ক্রীড়াক্ষেত্র। যা আজ থেকে প্রায় দু' হাজার বছর পূর্বে (৮০ খৃষ্টাব্দে) রোম সম্রাট তিতুস (Titus) বানিয়েছিল। এটি ছিল ষ্টেডিয়ামের ধাঁচে নির্মিত একটি ভবন, যার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার দর্শকের জন্য উপবেশন করে বিভিন্ন ক্রীড়া-কৌতুক ও দৈহিক কসরত দেখার ব্যবস্থা ছিল। এই ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হলে তিতুস একশ' দিন পর্যন্ত উৎসব করেছিল। এই ক্রীড়াক্ষেত্রে ক্রীড়া-কৌতুক দেখানোর জন্য ক্রীতদাসদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। তাদেরকে ইতিহাসে Gladiators বলে। তাদের পরস্পরের মধ্যে এবং কখনো কখনো বন্যপশুর সঙ্গে কুস্তি লড়ানো হত। আরো নানারকম দৈহিক কসরত প্রদর্শিত হত। এর ব্যবস্থাপকগণ বর্তমানেও এর আশেপাশে অনেক মানুষকে ঐ সমস্ত ক্রীতদাসের পোশাক পরিয়ে খাড়া করে রেখেছে। এই ক্রীড়াক্ষেত্রকে কোলোসিয়াম (Colossuem) এজন্য বলা হত যে, প্রসিদ্ধ রোম সম্রাট নিরোর একটি উপাধি কোলোসাসও (Colossus) ছিল। এখানে তার বিশাল এক ভাস্কর্য ছিল। এর সাথে সম্পৃক্ত করে এই ক্রীড়াক্ষেত্রকে কোলোসিয়াম বলতে আরম্ভ করা হয়।

রোম যেহেতু বিশ্বের প্রাচীনতম শহরসমূহের অন্যতম এবং এটি রোমান সভ্যতার কেন্দ্র ছিল, তাই তার প্রতিটি অংশ ইতিহাসে পরিপূর্ণ। সাত পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এ শহর প্রতি পদে পদে কোন না কোন স্মৃতি ধারণ করে আছে। সারা দুনিয়া থেকে পর্যটকদল এসব স্মরণীয় বস্তু দেখতে এসে থাকে। কিন্তু এ সমস্ত স্মরণীয় বস্তুর সর্বত্র থেকে শিক্ষা ও উপদেশের যে পাঠ উন্মুক্ত গ্রন্থের ন্যায় চিন্তার আহবান জানায়, বিনোদন ও পর্যটনের আবেগে সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার কেউ নেই। পবিত্র কুরআন এ জাতীয় নিদর্শনাবলী দেখে শিক্ষা ও উপদেশের এ সমস্ত দিককেই স্মরণ করিয়ে দেয়—

أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

"তারা কি পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করেনি যে, তারা দেখত, যারা তাদের পূর্বে ছিল, তাদের পরিণতি কী হয়েছে।'

এ সমস্ত নিদর্শন থেকে এ শিক্ষাই লাভ হয় যে, এ পৃথিবীতে মান-মর্যাদা, ধন-দৌলত, যশ-খ্যাতি, স্বাদ-উপভোগ ও শান-শওকত সবই ধ্বংসশীল, নশ্বর। যা চিরদিন টিকে থাকবে, তা কেবল মানুষের ঈমান ও সৎকর্ম, যার ফলাফল অবিনশ্বর ও অমর।

ভেনিসে

পরদিন আমরা ট্রেনযোগে ভেনিসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। ভেনিসকে আরবী ভাষায় 'বুন্দুকিয়া' বলা হয়। এটি প্রায় সাড়ে চার ঘন্টার পথ। পথে ইটালীর অনেক শহর অতিক্রম করতে থাকে। তার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ও সুদৃশ্য ফ্লোরেন্স শহরও ছিল। দুপুর একটার দিকে আমরা ভেনিসের রেলওয়ে ষ্টেশনে নামি। আমার বন্ধু সাঈদ সাহেব এখানে একটি হোটেলে বুকিং করিয়ে রেখেছিলেন। তিনি রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে হোটেলে ফোন করে পথের সন্ধান চাইলে হোটেল কর্তৃপক্ষ জানায় যে, আপনি ট্যাক্সি যোগেও আসতে পারেন, তাতে প্রায় ষাট ইউরো ব্যয় হবে। আর যদি বাসে আসেন, তাহলে বাস আমাদের হোটেলের ঠিক দরজায় আপনাদেরকে নামিয়ে দেবে, আর জনপ্রতি তিন ইউরো ভাড়া নিবে। সময়ও প্রায় একই লাগবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, তাহলে বাসেই যাওয়া উচিত। কিন্তু আমরা রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে বাইরে বের হয়ে সামনে একটি সামুদ্রিক জেটি দেখতে পাই। কোন ট্যাক্সিও চোখে পড়ছিল না, কোন বাসও দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে সম্মুখের সমুদ্রবক্ষে ছোট-বড় নৌকা দাঁড়িয়েছিল। জানতে পারলাম, এ নৌকাগুলোর নামই 'বাস' বা 'ট্যাক্সি'। ছোট নৌকা পুরোটা ভাড়া করলে তার নাম 'ট্যাক্সি'। সেগুলোর গায়েও ট্যাক্সি লেখা ছিল। আর যদি সম্মিলিত বড় নৌকায় বসা হয় তাহলে তা 'বাস'।

ভেনিসের এটিই বৈশিষ্ট্য। যা দেখার জন্য সারা পৃথিবীর পর্যটকগণ এখানে এসে থাকে যে, এই পুরো শহরটি পানির মাঝে অবস্থিত। এর মধ্যে আসা-যাওয়ার মাধ্যম এই নৌকাগুলোই। সুতরাং আমরা একটি পানির বাসে আরোহণ করলাম। এটি পানির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল আর বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়াচ্ছিল। কিছু লোক নামছিল আর কিছু আরোহণ

করছিল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর এই বাস আমাদেরকে যেখানে নামালো তার ঠিক সামনেই হোটেল পেনোরামা অবস্থিত। নৌকা থেকে নেমে আমরা সহজেই তাতে পৌঁছি।

ভেনিস মূলতঃ ইটালীর উত্তরে ভূমধ্যসাগরের এমন একটি প্রান্ত, যা একশ' আঠারোঠি ছোট–বড় দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। যেগুলোর মধ্যে একশ' আশিটি জলপথ রয়েছে। দ্বীপসমূহকে পরস্পরে যুক্ত করার জন্য ছোট–বড় চারশ'টি পুল নির্মাণ করা হয়েছে। এসব দ্বীপে যখন বাড়ী তৈরী করা হয়, তখন এক দ্বীপ থেকে অপর দ্বীপে যাতায়াতের জন্য এ সমস্ত জলপথ ব্যবহার করা হয়। যেগুলোতে যাতায়াত ও মালামাল বহনের মাধ্যম কেবল নৌকাই হতে পারে। ভেনিসের কিছু কিছু দ্বীপের অধিবাসীর অস্তিত্ব তো খৃষ্টপূর্ব কয়েক হাজার বছর থেকে বলা হয়। তবে একটি সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত শহরের পর্যায়ে তা রোমান সাম্রাজ্যকালে উপনীত হয়। এতে কয়েক শতাব্দী সময় লাগে। ভেনিসের ভবনসমূহ—যার অনেকগুলো বহুতলাবিশিষ্টও রয়েছে—পানির তীরে দাঁড়ানো দেখা যায়। ফলে দর্শকদের উপলব্ধি হয় যে, ভবনগুলো যেন পানির মধ্যেই নির্মাণ করা হয়েছে। অথচ তা মূলতঃ প্রাকৃতিক দ্বীপসমূহের উপরই নির্মিত। তবে কোথাও কোথাও পানির অংশ সমতল করেও ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

বিকেল বেলা আমরা পানির 'বাসে' করেই শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় যাই। যেখানকার 'মার্কস' স্কোয়ার (St. Mark Square) সৌন্দর্য, ঐতিহ্য ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ। শুরুতে এটি একধরনের কাঁচাবাজার ছিল। পরবর্তীতে জনৈক সম্রাটের নির্দেশে তা পরিস্কার করে বিনোদনমূলক একটি স্কোয়ারের রূপ দেওয়া হয়। তার চতুর্দিকে একই ডিজাইনের তিনতলা বিশিষ্ট ভবন রয়েছে। যেগুলোর বারান্দায় রোমান ধাঁচের অনেকগুলো মেহরাব রয়েছে। বর্তমানে সেগুলো শপিং সেন্টাররূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবনগুলোর প্রান্তে একটি ক্লক' টাওয়ার রয়েছে, যা ভেনিসের সর্বোচ্চ মিনার।

'মার্কস' স্কোয়ার থেকে অনেকগুলো গলিপথ শহরাভ্যন্তরে চলে গেছে। গলিপথগুলো লোকদেরকে শহরাভ্যন্তরের জলপথসমূহ পর্যন্ত

পৌঁছিয়ে দেয়। যেগুলোর উপর ছোট ছোট পুল নির্মিত হয়েছে এবং সেগুলোর মধ্য দিয়ে ছোট ছোট নৌকা চলাচল করে। এখানেই ভিতরে গেলে সেই রিয়ালটো টাওয়ার অবস্থিত, যার উপর দাঁড়িয়ে শহরের প্রধান নদী গ্রাণ্ড কিন্যালের দৃশ্য অধিকতর স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়।

মোটকথা, এ শহরটি এদিক থেকে একটি বিস্ময়কর বস্তু যে, তা পানির মধ্যে বিস্তৃত একটি শহর। যেখানে জল ও স্থলের অধিবাসীরা পরস্পরে বসবাসের জন্য সমঝোতা স্থাপন করেছে। যুগের বিস্ময় এ শহরটিতে একদিন এক রাতের অবস্থান বেশ মনোমুগ্ধকর হয়।

১৫ই অক্টোবর আমাকে লণ্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়। বিমানবন্দরেও পানির বাস যোগেই যাই। এক জায়গায় এই বাস থামলে জানতে পারি যে, এখানে ভেনিসের প্রসিদ্ধ গ্লাস ফ্যাক্টরী রয়েছে। তাতে কাঁচের গ্লাস ও অন্যান্য পাত্র তৈরী হয়।

আমি ভেনিস থেকে লণ্ডন যাই। ১৬ই অক্টোবর সেখানে একটি মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করি। ১৭ই অক্টোবর শেফিল্ডে একটি মাদরাসার উদ্বোধন ছিল। সেখানে অংশগ্রহণ ও বক্তব্যদানের সুযোগ হয়। বিকেলেই আমি অক্সফোর্ড চলে যাই। ১৮ই অক্টোবর অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করি। সেই বিকেলেই লণ্ডন ফিরে এসে একরাত সেখানে অতিবাহিত করি। ১৯শে অক্টোবর সেখান থেকে ওয়াশিংটন যাই। সে রাতেই সেখানকার একটি সমাবেশে বক্তব্য ছিল। তার পরবর্তী দু'দিনও বিভিন্ন সমাবেশে কাটে। ২৩শে অক্টোবর ওয়াশিংটন থেকে রওয়ানা হয়ে ২৪ তারিখ রাতে আলহামদুলিল্লাহ করাচী ফিরে আসি। এখানে এসে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। অসুস্থ অবস্থায় জটিল বা সমস্যাপূর্ণ কোন কাজ করার স্বাস্থ্য অনুমতি দিচ্ছিল না। তাই হালকা ধরনের কাজ হিসেবে ভ্রমণ বৃত্তান্তের এ লাইনগুলো লেখার সুযোগ পেয়ে যাই।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا
و مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.

সমাপ্ত